কোম্পানি সংগঠন
Company Organization

৬

ব্যবসায়ের প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে বৃহদায়তন ও জটিলরূপ ধারণ করলে একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মানুষ নতুন ধরনের ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিপুল পুঁজি, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ, ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদি সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে এ নতুন ব্যবসায় সংগঠন তার সকল ডালপালা প্রসারিত করতে শুরু করে। সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে আইনানুসারে গঠিত কতিপয় ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচালিত ব্যবসায় সংগঠন হচ্ছে কোম্পানি সংগঠন বা যৌথমূলধনী কোম্পানি। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী এ ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন আজ সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয়। দিন দিন কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধিই এর প্রমাণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এসব কোম্পানির মধ্যে প্রাইভেট কোম্পানিই সর্বাধিক- তিন চতুর্থাংশেরও বেশি। এ ইউনিটে আমরা কোম্পানি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১: কোম্পানি সংগঠন: উপক্রমনিকা
পাঠ - ৬.২: কোম্পানি সংগঠন: বিভিন্ন প্রকার কোম্পানি
পাঠ - ৬.৩: প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
পাঠ - ৬.৪: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
পাঠ - ৬.৫: কোম্পানির গঠন
পাঠ - ৬.৬: কোম্পানির মূলধন: শেয়ার ও ঋণপত্র
পাঠ - ৬.৭: কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী
পাঠ - ৬.৮: কোম্পানির সভা ও বিলোপসাধন

পাঠ ৬.১ কোম্পানি সংগঠন: উপক্রমনিকা
Company Organization: An Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কোম্পানি সংগঠন কী বলতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় নামেও পরিচিত যার ইতহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। ব্রিটিশদের রাজত্বকালে ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ-রাজ এ উপমহাদেশে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এ আইনটি প্রথমে ১৯৩৬ সালে এবং পরে ১৯৩৮ সালে তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক দুবার সংশোধিত হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তান সরকার ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন বলবৎ রাখে এবং ১৯৬৯ সালে এ আইনে সামান্য কিছু সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আদেশ' -এর কতিপয় বিধানের ফলে কোম্পানি আইন কিছুটা সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনে অনেক পরিবর্তন করা হয় এবং যে কোনো প্রকার যৌথ মূলধনী ব্যবসায় এ আইন অনুযায়ীই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভা 'ওয়ান ম্যান কোম্পানি' গঠনের অনুমতির বিধান রেখে কোম্পানি (সংশোধনী) আইন-২০১৮ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত এ আইনে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি 'ওয়ান ম্যান কোম্পানি' গঠন করতে পারবে। কোম্পানি আইনের সংশোধনীতে একটি নতুন ধারণা আনা হয়েছে, যা দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যে এতোদিন ছিল অনুপস্থিত। আমাদের বর্তমান আইনে এ ধারণা ছিল না। তবে বিশ্বের অনেক দেশে এ আইন আছে। বর্তমান আইনে সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠনের বিধান রয়েছে। তবে এ বিধান ওয়ান ম্যান কোম্পানি গঠনের ক্ষত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেবল একজন ব্যক্তি এ ধরনের একটি কোম্পানি গঠন করতে পারবে। যেহেতু এ আইনটি এখনো পাশ হয়নি সেহেতু এ পাঠসহ সমগ্র ইউনিটটি আমরা কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আলোকে আলোচনা করবো।

কোম্পানি সংগঠনের সংজ্ঞা
Definition of company organization

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় এক প্রকার স্বেচ্ছামূলক সংগঠন যেখানে বহু ব্যক্তি মিলিত হয়ে ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি যৌথ তহবিল গঠন করে। এ ব্যক্তিগণ ব্যবসায় থেকে উদ্ভুত মুনাফা ভোগ করা বা লোকসানের ক্ষতি বহন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিলমোহর বিশিষ্ট আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিকে কোম্পানি নামে অভিহিত করা হয়।[১] অন্যভাবে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে কোম্পানি সংগঠন বা যৌথমূলধনী কোম্পানি বলে। সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে গঠিত এ সংগঠন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, এর নিজস্ব সিলমোহর থাকে এবং এটি দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। কোম্পানি সংগঠন (সংক্ষেপে কোম্পানি) সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

[১] ড. এম. এ. মাননান (২০০০). *ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং সচিবের কর্ম-প্রণালী*, প. ৩৬৭.

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১) ধারায়** বলা হয়েছে, "কোম্পানি বলতে এ আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানি বা বিদ্যামান কোম্পানিকে বোঝায়।" [Company means a company formed and registered under this Act or any existing company]
- **John Marshall** (বিচারপতি জন মার্শাল) এর মতে, "কোম্পানি হলো আইনের চোখে অস্তিত্বময় একটি অদৃশ্যমান কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা।" [A company is an artificial being, invisible, intangible and existing only in contemplation of law][২]

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোম্পানি সংগঠন হচ্ছে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে গঠিত চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন যা কতিপয় ব্যক্তির যৌথমূলধন নিয়ে পরিচালিত হয়।

কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা কী

সত্তা যখন প্রকৃত না হয়ে কৃত্রিম হয়, তখনই এরূপ সত্তাকে কৃত্রিম সত্তা বলে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, আল্লাহ প্রদত্ত। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা থাকতে পারে না। তবে বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোনো কোম্পানি নিবন্ধিত হবার পর একরূপ আইনগত সত্তা অর্জন করে। এ সত্তা আইন দ্বারা আরোপিত; তাই সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আইনানুযায়ী কোম্পানি যে সত্তা অর্জন করে, তাকেই বলা হয় কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা। মানুষের মতো এর অবয়ব না থাকলেও আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কৃত্রিম সত্তার কারণে একটি কোম্পানি মানুষেরই মতো অন্যের সাথে চুক্তি করতে পারে, লেনদেন করতে পারে, অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে এবং এমনকি অন্যরাও প্রয়োজনে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। তবে এসব করার জন্য কোম্পানির পক্ষে পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হয়। তারা কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা কোম্পানি থেকে পৃথক একটি পক্ষ। কোম্পানি কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তার অধিকারী। এ কারণে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের সাথে স্বাধীন সত্তা হিসেবে লেনদেন ও চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচরার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আইনের দ্বারা কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত সত্তাকে কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলে, যার বলে বলীয়ান হয়ে কোম্পানি ব্যক্তির মতোই অন্যান্য পক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনসহ বিবিধ প্রকার লেনদেন করতে পারে।

কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of company organization

কোম্পানি সংগঠন আইনানুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত কতিপয় ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট একটি ব্যবসায় সংগঠন। বৃহদায়তন এ সংগঠনের কতগুলো আইনানুগ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উভয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. আইনগত বৈশিষ্ট্য

১. **আইনের সৃষ্ট (Creation of law):** কোম্পানি ব্যবসায় দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত হয়। এরূপ ব্যবসায়ের গঠন ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি পর্যায় উক্ত আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যবসায় কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর বিধান অনুসারে গঠিত হয়।

২. **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন (Compulsory registration):** কোম্পানি ব্যবসায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হতে হয়। যে কোনো কোম্পানির জন্যই নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

[২] As stated by Chief Justice Marshall in Dartmouth College v. Woodward (1819).

৩. **সিলমোহর (Seal):** আইন দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় কোম্পানি সংগঠনের নিজস্ব সিলমোহর থাকে। নিজের নামাঙ্কিত এ সিলমোহর থাকায় কোম্পানি নিজ নামে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে।

৪. **কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা (Artificial personality):** কোম্পানি সংগঠন কৃত্রিম সত্তার অধিকারী। আইনই তাকে এরূপ সত্তা প্রদান করেছে। মানুষের ন্যায় এর অবয়ব না থাকলেও আইনের সৃষ্টিতে কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত। যে কোনো ব্যক্তির ন্যায় কোম্পানি নিজ নামে ব্যবসায় চালাতে পারে।

৫. **চিরন্তন অস্তিত্ব (Perpetual succession):** কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা কোম্পানিকে চিরন্তন বা স্থায়ী অস্তিত্বের সুযোগ এনে দিয়েছে। মালিকানার পরিবর্তন, এমনকি সদস্যদের মৃত্যু ঘটলেও কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। আইন অনুসারে বিলোপ সাধন করা না হলে কোম্পানির ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না।

৬. **সীমিত দায় (Limited liability):** কোম্পানি ব্যবসায়ের সদস্যদের অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডাদের দায় সীমাবদ্ধ। তারা যে পরিমাণ অর্থের শেয়ার ক্রয় করে শুধু সেই পরিমাণ অর্থেই তাদের দায় সীমিত থাকে।

৭. **শেয়ার (Share):** কোম্পানি ব্যবসায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর মূলধনকে বিভিন্ন শেয়ারে বিভক্তিকরণ। মূলধনকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি আংকিক মূল্য থাকে।

৮. **আইনানুগ পরিচালনা (Legal control):** কোম্পানি ব্যবসায়ের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধান মেনে চলতে হয়।

৯. **বাধ্যতামূলক নিরীক্ষা (Compulsory audit):** প্রত্যেক কোম্পানিকে বাধ্যতামূলকভাবে বার্ষিক হিসাবপত্র চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাতে হয়।

খ. সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. **ঐচ্ছিক সংস্থা (Voluntary association):** কোম্পানি ব্যবসায় কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট একটি ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছামূলক ব্যবসায়।

২. **সদস্য পদ (Membership):** কোম্পানি ব্যবসায়ের সদস্যপদ লাভ করার জন্য শেয়ার ক্রয় করা বাধ্যতামূলক। শেয়ার ক্রয় না করে কেই কোম্পানির সদস্য বা শেয়ারহোল্ডার হতে পারে না।

৩. **সদস্য সংখ্যা (Number of members):** প্রকারভেদ অনুযায়ী কোম্পানি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন হয়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ৫০ জন এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা নিম্নে ৭ জন এবং ঊর্ধ্বে শেয়ার দ্বারা সীমিত।

৪. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of share):** কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা যায়। এক্ষেত্রে যে সদস্য শেয়ার হস্তান্তর করে তার সদস্যপদ রহিত হয়ে যায়।

৫. **ব্যবস্থাপনার সাথে মালিকানার বিচ্ছিন্নতা (Separation of ownership and management):** কোম্পানির মালিকগণ সরাসরি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত থাকে না। ফলে ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা একে অপরের থেকে দূরে অবস্থান করে।

৬. **মালিকানার ব্যাপ্তি (Expansion of ownership):** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে নতুন নতুন শেয়ার বিক্রয় করে মালিকানার ব্যাপ্তি বাড়ানো সম্ভব।

৭. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic administration):** কোম্পানির পরিচালকগণ সাধারণত বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাছাড়া পলিসি নির্ধারণের ব্যাপারেও সংখ্যা গরিষ্ঠ শেযারহোল্ডারদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক নীতির প্রচলন ঘটে।

৮. **লভ্যাংশ বণ্টন (Distribution of profit):** মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করার পর সংগঠনের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে শেয়ারের অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করা হয়।

কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব

Importance of company organization

ব্যবসায় জগতে বৃহদায়তন উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেওয়ায় কোম্পানি সংগঠন সারাবিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বৃহৎ পুঁজি গঠন, শেয়ার মালিকদের কম ঝুঁকিসহ কতিপয় সুবিধাজনক

অবস্থানে থাকায় কোম্পানি সংগঠন অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের তুলনায় এক স্বকীয় ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলাচনা করা হলো:

১. **বিপুল পুঁজির সমাহার (Accumulation of large amount of capital):** কোম্পানি সংগঠনে বিপুল সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত হরার সুবিধা থাকয় এটি বড় আকারের মূলধন যোগাড় করতে সক্ষম। তাই কোম্পানি বৃহৎ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হরার সুযোগ অধিক।

২. **বৃহদায়তন উৎপাদন (Large scale of production):** বর্তমান বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে উৎপাদন কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এর পরিমাণগত সীমাবদ্ধতাও কাম্য নয়। সেক্ষেত্রে কোম্পানি সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বৃহদায়তন উৎপাদনের পথকে উন্মোচন করেছে।

৩. **চমৎকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র (A charming investment field):** কোম্পানি সংগঠন বর্তমান বিশ্বে এক চমৎকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ কারণ যেমন-পৃথক সত্তা, সীমিত দায়, চিরন্তন অস্তিত্ব ও স্বল্পমূল্যের শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ থাকায় বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৪. **সঞ্চয়ে আগ্রহ সৃষ্টি (Interest for saving):** কোম্পানি সংগঠনে কম বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকায় সঞ্চয়কারীরা অনায়াসেই এতে বিনিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। মুনাফা প্রাপ্তি, অগ্রাধিকার ও রাইট শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারীদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় তা ব্যক্তি জীবনে ও জাতীয় জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৫. **ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ (Opportunity for distribution of risk):** কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত হবার কারণে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি বণ্টনের সুযোগ অধিক। এর ফলে বৃহদায়তনের ও অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কোনো ব্যবসায়িক কর্ম সম্পাদন করা কোম্পানির ক্ষেত্রেই সম্ভব।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Employment opportunity):** কোম্পানি ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হবার কারণে এটি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। বৃহৎ সংগঠনে অধিক কর্মী নিযুক্ত হবার সুযোগ থাকায় বেকার সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য কোম্পানি সংগঠন এক আশীর্বাদস্বরূপ।

৭. **সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহার (Use of latest technology and expertise):** অধিক পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়ে তোলার সুযোগ থাকায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহার করা সম্ভব হয়। গবেষণা ও উন্নয়নে মাধ্যমে পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি করে জাতীয় চাহিদা পুরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

৮. **দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন (Raising economic growth of the country):** ব্যাপকভিত্তিক বিনিয়োগ কাজে সম্পৃক্ত থাকার ফলে কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যাপক কর সরকারি কোষাগারে জমা হয়। ফলে দেশের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এতে অর্থনীতির গতি সঞ্চার হয়।

৯. **সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ (Participation in social development):** কেবল মুনাফা অর্জনই নয়, কোম্পানি সংগঠন সামাজিক প্রগতি ও উন্নয়ননের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে। কোম্পানি সংগঠনের সাথে জড়িত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থেই শুধু নয়, সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেও এটি স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে।

১০. **শিল্পোন্নয়ন (Industrial development):** কোম্পানি সংগঠন দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তুলে দেশের শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা কোম্পানি ব্যবসায়ই শিল্প উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করে বেশি।

১১. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন (Achieving international cooperation):** কোম্পানি সংগঠনের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হবার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অংঙ্গনে বিস্তার লাভ করে। এতে এক দেশের সাথে অন্য দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের স্বার্থে এগিয়ে আসে বিধায় এতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

ওপরের আলোচিত বিষয়সমূহ ছাড়াও কোম্পানি সংগঠন ব্যবস্থাপনার পেশাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোম্পানি ব্যবসায়ের তাৎপর্য অপরিসীম। শুধু ক্রেতার চাহিদা

পূরণই নয়, দেশের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন , সামাজিক সেবা সম্প্রসারণসহ সকল ক্ষেত্রেই কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব সমধিক।

বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠন

Company organization in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। আবার শিক্ষিতের হার এদেশে অতীত থেকেই নিতান্তই কম। যদিও ক্রমান্বয়ে শিক্ষিতের হার বাড়ছে। এ কারণে এদেশে শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক ব্যবসায় একমালিকানাধীনে গড়ে ওঠেছে। পক্ষান্তরে, কোম্পানি ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হয়েছে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাংলাদেশে নগণ্য।

এদেশে যেসব বৃহদায়তন কোম্পানি রয়েছে তাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি মালিকানায় সরকারি কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকেই অধিকাংশ বৃহৎ কোম্পানি সংগঠনকে জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য দূর করা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করা । কিন্তু বাস্তবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হওয়ায় সরকার বর্তমানে এ সংগঠনগুলোকে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে যেসব নিবন্ধিত কোম্পানি রয়েছে তারমধ্যে অধিকাংশই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ২০১৫ সালের জুন নাগাদ বাংলাদেশে সর্বমোট নিবন্ধিত কোম্পানির (যৌথমুলধনী কোম্পানি) সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার।[৩] বাংলাদেশে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অপেক্ষা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গড়ে ওঠার পেছনে মূল কারণ ছিল পুরনো আইনের (১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন) শিথিল নিয়ন্ত্রণ। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে প্রাইভেট কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। তবুও ১৯৯৭ সালের জুন থেকে ২০০০ সালের একই সময় পর্যন্ত এ চার বছরে ৮৩৭১ টি নতুন প্রাইভেট কোম্পানি নিবন্ধিত হয়। অথচ এ চার বছরে নতুন নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬৬টি। পরবর্তীতে প্রাইভেট কোম্পানির নিবন্ধনের হার আরও বৃদ্ধি পায়।

এদিকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা ২০১৮ সালের হিসাব মতে মোট ৫৮৮টি। অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ২০১৯ সালের হিসাব মতে মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ২৫০টি।

তবে সার্বিক বিচারে আমাদের দেশ কোম্পানি সংগঠনের প্রসার সীমিতই বলা চলে। বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের ব্যাপক বিস্তার না ঘঠার পশ্চাতে বেশি কিছু কারণ নিহিত রয়েছে। এগুলো নিম্নোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের অনগ্রসরতার কারণ

কতিপয় কারণে বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের কাঙ্খিত প্রসার ও বিকাশ সাধিত হয়নি। এ কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. **পুজির স্বল্পতা:** বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি শীর্ষস্থানীয় দরিদ্র দেশ। যৌথমূলধনী কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক পুঁজি আবশ্যক। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের পুঁজির স্বল্পতার কারণে এ ধরনের বৃহৎ ব্যবসায়ে তাদের আকর্ষণ কম। বরং তারা স্বরূপ পুঁজির একমালিকানা ব্যবসায়ে অধিক আকৃষ্ট হচেছ।

২. **কৃষি নির্ভরতা:** বাংলাদেশ মূলত কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং গ্রামে বাস করে। একারণে কোম্পানি সংগঠনের মতো বৃহৎ ব্যবসায় গড়ে তোলার মনমানসিকতা এবং অনুকূল পরিবেশ দুটোই তাদের নেই।

৩. **উদ্যোক্তার অভাব:** কোম্পানি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের দক্ষ, অভিজ্ঞা ও উদ্যমী উদ্যোক্তা দরকার আমাদের দেশে তার সংকট প্রকট। এ কারণে এ ব্যবসায় তেমন গতি লাভ করতে পারেনি।

[৩] Govt securities can now be traded on DSE. *The Daily Star*. Retrieved 6 November 2017.

৪. **ঢালাও জাতীয়করণ:** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্প কারখানাকে ঢালাওভাবে জাতীয়করণ করা হয়। এতে ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্যোগে ভাটা পড়ে। এর রেশ দীর্ঘকাল বিদ্যামন থাকায় কোম্পানি সংগঠন বিকশিত হতে পারেনি।

৫. **অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ:** রাজনৈতিক অস্থিতিশীল বাংলাদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে, বিশেষ করে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের বিস্তারে এক বড় অন্তরায়। হরতাল , ধমূঘট, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, সরকারি নীতি ঘনঘন পরিবর্তন ইত্যাদির সমস্যগুলো দেশি বিদেশি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।

৬. **ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি:** বাংলাদেশে বড় বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা সরকারি ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ না করেই পার পেয়ে যায়। ফলে সত্যিকারের উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে এ ব্যবসায়ের প্রসার আর ঘটতে পারেনি।

৭. **বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব:** সকলেই আজ বিশ্বায়ন (Globalization) তথা উদার বাণিজ্য নীতির কথা ভাবছে। এ বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য বিশ্ব বাজারে টিকতে পারছে না। ফলে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে শিল্পায়ন তথা কোম্পানি সংগঠনের বিকাশ।

৮. **শিল্পনীতি ও আইনি সহযোগিতা:** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোম্পানি সময়োপযুগী আইন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে ১৯১৩ সালের পুরাতন আইনই প্রচলিত ছিল। এছাড়া সুষ্ঠু শিল্পনীতি প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় শিল্প সংগঠনগুলো সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কোম্পানি সংগঠন তার কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

৯. **শক্তিশালী পুজিবাজারের অভাব:** কোম্পানি সংগঠনের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ধরনের শক্তিশালী পুজিবাজার থাকা দরকার তা বাংলাদেশের পুজিবাজার অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠায় কোম্পানি শেয়ার লেনদেন কার্যক্রম কিছুটা গতিশীল হয়েছে। তবে শেয়ার বাজারের স্থিরতা ধরে রাখতে পারলে এ বাজার সবসময় গতিময় থাকবে।

কোম্পানি সংগঠনের উল্লিখিত অসুবিধাগুরোর কারণে বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠন দ্রুত অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের শুভহস্তক্ষেপে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় এক প্রকার স্বেচ্ছামূলক সংগঠন যেখানে বহু ব্যক্তি মিলিত হয়ে ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি যৌথ তহবিল গঠন করে। এ ব্যক্তিগণ ব্যবসায় থেকে উদ্ভুত মুনাফা ভোগ করা বা লোকসানের ক্ষতি বহন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। আইনানুযায়ী কোম্পানি যে সত্তা অর্জন করে, তাকেই বলা হয় কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা। এ কৃত্রিম সত্তার কারণে একটি কোম্পানি মানুষেরই মতো অন্যের সাথে চুক্তি করতে পারে, লেনদেন করতে পারে, অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পাওে, এমনকি অন্যরাও প্রয়োজনে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। বৃহদায়তন এ সংগঠনের কতগুলো আইনানুগ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যবসায় জগতে বৃহদায়তন উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেওয়ায় কোম্পানি সংগঠন সারাবিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বৃহৎ পুঁজি গঠন, শেয়ার মালিকদের কম ঝুঁকিসহ কতিপয় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় কোম্পানি সংগঠন অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের তুলনায় এক স্বকীয় ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠ ৬.২ কোম্পানি সংগঠন: বিভিন্ন প্রকার কোম্পানি
Company Organization: Types of Companies

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কোম্পানির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের কোম্পানিগুলো সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি গঠিত হতো। ১৯৯৪ সালে পূর্বের আইনকে পরিমার্জিত করে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের মাধ্যমে নতুন আইন জারি করা হয়। এটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ নামে পরিচিত। তখন থেকে এদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কোম্পানি নিবন্ধন কর হচ্ছে। বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানি আইন ও পূর্বেকার আইনানুসারে বহুবিধ কোম্পানি গঠন করা যায়। এ পাঠে আমরা কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আলোকে বিভিন্ন প্রকার কোম্পানি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ
Kinds of company organization

একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে গড়ে ওঠেছে নতুন সংগঠন কাঠামো কোম্পানি সংগঠন। কোম্পানির গঠন প্রকৃতি, দায়, মালিকানা ইত্যাদির তারতম্য ভেদে নিম্নলিখিত যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখতে পাওয়া যায়:

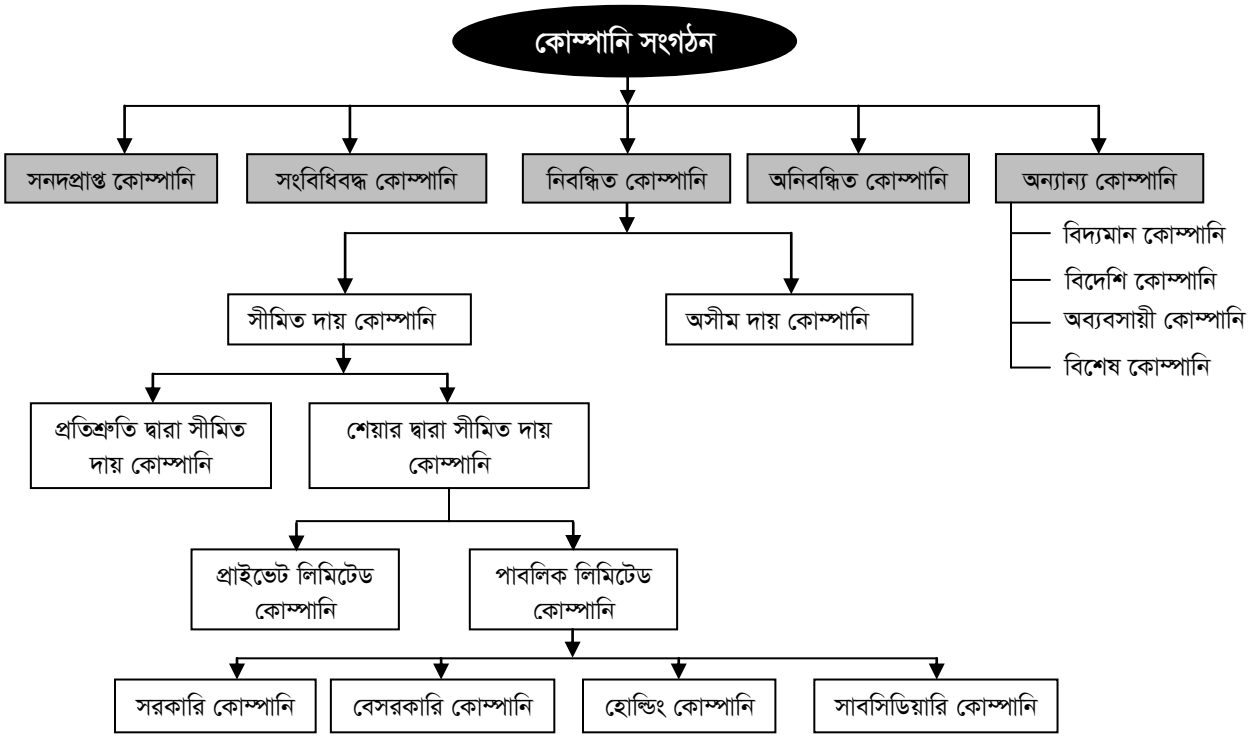

চিত্র ৬.১: যৌথমূলধনী কোম্পানির শ্রেণিবিভাগ

সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি, বিধিবদ্ধ কোম্পানি ও অনিবন্ধিত কোম্পানিগুলো এককভাবেই বিরাজ করে। এগুলোকে উপ-বিভাগে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু নিবন্ধিত কোম্পানিকে (ক) অসীমদায় ও (খ) সসীমদায় কোম্পানি হিসেবে দুটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। সসীমদায় কোম্পানি মূলত দুই প্রকার: (১) প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি এবং (২) শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড যেকোনো প্রকার হতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি চার প্রকারের হয়: (ক) সরকারি কোম্পানি (খ) বেসরকারি কোম্পানি (গ) হোল্ডিং কোম্পানি এবং (ঘ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। এছাড়াও, অন্যান্য আরো কিছু ধরনের কোম্পানি দেখতে পাওয়া যায়: বিদ্যমান কোম্পানি, বিদেশি কোম্পানি, অব্যবসায়ী কোম্পানি এবং বিশেষ কোম্পানি।

আসুন, এ কোম্পানিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

১. **সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি (Chartered company):** ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানি আইন প্রণীত হরার পূর্বে রাজকীয় সনদ বা ঘোষণার মাধ্যমে কোম্পানি সংগঠন গঠিত হত। রাজা বা রাণীর ঘোষণাবলে গঠিত এ জাতীয় কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে। পূর্বে ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে এ ধরনের কোম্পানি গঠিত হতো। রাজার ঘোষণা তাথা রাজকীয় সনদবলে গঠিত হবার কারণে এ জাতীয় কোম্পানিকে সনদ প্রাপ্ত কোম্পানি বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, চাটার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ইত্যাদি এ জাতীয় কোম্পানির উদাহরণ। ১৮৪৪ সালে কোম্পানি আইন প্রণীত হবার পর এ জাতীয় কোম্পানি আর দেখা যায়নি।

২. **সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি (Statutory company):** জনকল্যাণমূলক কার্য সমপাদনের জন্য আইন দ্বারা যৌথ মুলধনী কোম্পানি গঠন করা হরে তাকে সংবিধিবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বিধিবদ্ধ কোম্পানি রয়েছে; যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ইত্যাদি।

৩. **নিবন্ধিত কোম্পানি (Registered company):** কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানি সংগঠনের নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধনভুক্ত কোম্পানিকে নিবন্ধিত কোম্পানি বলে। কোনো ব্যবসায় ২০ জনের বেশি সদস্য হলে (ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ১০জন) ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী সেই ব্যবসায়কে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামুলক। এরূপ কোম্পানি আবার দুই প্রকার:

ক. অসীম দায় কোম্পানি (Unlimited company): কোনো নিবন্ধিত কোম্পানির সদস্যদের দায় যদি সীমাহীন হয় তাহলে সেই কোম্পানিকে অসীম দায় কোম্পানি বলা হয়। অসীম দায় কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাহীন হওয়ায় তারা কোম্পানির ঋণের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও দায়ী থাকে। কোন পাওনাদার যদি কোম্পানির নিকট থেকে পুরো পাওনা আদায় করতে না পারে তাহলে সে সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে।

খ. সীমিত দায় কোম্পানি (Limited company): যে সব কোম্পানির সদস্যদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য বা প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ ধারা সীমিত থাকে সেসব কোম্পানিকে সীমিত দায় কোম্পানি বলে। এ ধরনের কোম্পানি দুই প্রকার হয়ে থাকে:

- **প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি (Company limited by guarantee):** এ জাতীয় কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য ব্যবসায়ের ঋণের একটা নির্দিষ্ট অংশ (যেমন ১/২০ ভাগ, ১/১০ ভাগ ইত্যাদি) পরিশোধ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রয়োজনবোধে সে দায় বহনও করে। এরূপ ব্যবসায়ে কোনো সদস্য যত টাকার শেয়ারই ক্রয় করুক না কেনো কোম্পানি অবসায়নকালে দেনার দায় বহন করার জন্য তাকে অঙ্গীকার করতেই হয়। আজকাল দেখা না গেলেও পূর্বে ক্লাব, বণিক সমিতি ইত্যাদি এ জাতীয় কোম্পানি হিসেবে গঠিত হতো।
- **শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি (Company limited by shares):** যে কোম্পানির সদস্যদের দায় ক্রীত শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য পর্যন্ত সীমিত থাকে তাকে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলে। বর্তমান যুগে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংখ্যাই বেশি এবং বিশেষ জনপ্রিয়ও বটে। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি আবার দুই প্রকার:
  - **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private limited company):** কোনো লিমিটেড কোম্পানি যদি সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং জনগণের নিকট প্রকাশ্যে শেয়ার

বিক্রয় ও শেয়ার হস্তান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় তবে তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

- **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public limited company):** যে কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে অবাধে শেয়ার হস্তান্তরের সুযোগসহ কমপক্ষে ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়:
    - **সরকারি কোম্পানি (Government company):**সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট যে কোম্পানিতে সরকারের কমপক্ষে ৫১% শেয়ার থাকে তাকে সরকারি কোম্পানি বলে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট শতকরা ৪৯ ভাগের বেশি শেয়ার বিক্রয় করা হয় না।
    - **বেসরকারি কোম্পানি (Non-government company):** সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট যে কোম্পানির সকল বা বেশির ভাগ শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় থাকে তাকে বেসরকারি কোম্পানি বলে। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ওপরই এর মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।
    - **হোল্ডিং কোম্পানি (Holding company):** যে কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির শতকরা ৫০% ভাগের অধিক শেয়ার ক্রয় করে নিজের অধিকারে রাখে কিংবা অন্য কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে।
    - **সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (Subsidiary company):** যখন কোন কোম্পানি ৫০% এর অধিক শেয়ারের মালিকানা, ভোটদান ক্ষমতা, কোম্পানির পরিচালনা ইত্যাদি অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকে তখন উক্ত কোম্পানিকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানিকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে।

৪. **অনিবন্ধিত কোম্পানি (Unregistered company):** ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৩৭১ ধারা অনুযায়ী অনিবন্ধিত কোম্পানি হলো এমন এক ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় বা সমিতি যা ঐ আইনের আওতায় নিবন্ধন করা হয়নি। এ ধরনের কোম্পানিকে মূলত কোম্পানি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না কিন্তু কোম্পানির বিলুপ্তিকালে সীমিত পর্যায়ে একে কোম্পানি হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের কোম্পানি দেখা যায় না।

৫. **অন্যান্য কোম্পানি (Other companies):** আলোচিত কোম্পানিগুলোর বাহিরেও কয়েক ধরনের কোম্পানি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে:

ক. বিদ্যমান কোম্পানি (Existing company): ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন প্রণীত হবার পূর্বে প্রচলিত কোম্পানি আইনের আওতায় কোনো কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হয়ে বর্তমানেও চালু থাকলে উক্ত আইনের ২-১ (ঢ) ধারা মোতাবেক তাকে বিদ্যামান কোম্পানি বলে।

খ. বিদেশি কোম্পানি (Foreign company): বিদেশি কোম্পানি বলতে বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানিকে বোঝায়। এরা সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায় পরিচালনা করে।

গ. অব্যবসায়ী কোম্পানি (Non-trading company): সাধারণত শিল্পকলা, ধর্মীয়, দাতব্য কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য এ কোম্পানি গঠিত হয়। অর্থাৎ যে ধরনের কোম্পানি তার অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করে তাকে অব্যবসায়ী বা লাভবিহীন কোম্পানি বলে।

ঘ. বিশেষ কোম্পানি (Special company): দেশে প্রচলিত অন্য কোনো বিশেষ আইন দ্বারা যে কোম্পানি পরিচালিত হয় তাকে বিশেষ কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে বিমা ও ব্যাংকি কোম্পানিগুলো এ জাতীয় কোম্পানির উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ

একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে গড়ে ওঠেছে নতুন সংগঠন কাঠামো কোম্পানি সংগঠন। কোম্পানির গঠন প্রকৃতি, দায়, মালিকানা ইত্যাদির তারতম্য ভেদে এ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখতে পাওয়া যায়। সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি, বিধিবদ্ধ কোম্পানি ও অনিবন্ধিত কোম্পানিগুলো এককভাবেই বিরাজ করে। এগুলোকে উপ-বিভাগে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু নিবন্ধিত কোম্পানিকে (ক) অসীমদায় ও (খ) সসীমদায় কোম্পানি হিসেবে দুটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। সসীমদায় কোম্পানি মূলত দুই প্রকার: (১) প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি এবং (২) শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড যেকোনো প্রকার হতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি চার প্রকারের হয়: (ক) সরকারি কোম্পানি (খ) বেসরকারি কোম্পানি (গ) হোল্ডিং কোম্পানি এবং (ঘ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। এছাড়াও, অন্যান্য আরো কিছু ধরনের কোম্পানি দেখতে পাওয়া যায়: বিদ্যমান কোম্পানি, বিদেশি কোম্পানি, অব্যবসায়ী কোম্পানি এবং বিশেষ কোম্পানি।

পাঠ ৬.৩ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
Private Limited Company

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী বলতে পারবেন।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারবেন।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

যারা একই সাথে সীমাবদ্ধ দায়ের সুবিধা এবং ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব নিজেদের হাতে ধরে রাখার সুবিধা ভোগ করবার অভিলাষী তাদের জন্য প্রাইভেট কোম্পানি বিশেষভাবে উপযোগী। অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে প্রাইভেট কোম্পানির কতিপয় মিল থাকলেও কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ হওয়ায় (যা অংশীদারি ব্যবসায়ে সাধারণত নেই) ব্যবসায়ীরা প্রাইভেট কোম্পানিই বেশি পছন্দ করে। আসুন তাহলে জেনে নেই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী, এর বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলো।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংজ্ঞা
Definition of private limited company

সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোনো কোম্পানি যদি ২ থেকে ৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর করার অধিকার সীমাবদ্ধ করে দেয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। তুলনামূলকভাবে এরূপ কোম্পানি ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে এবং একে কঠোর আইনগত নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই দেওয়া হয়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানি কিংবা ঘরোয়া সসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি নামেও অভিহিত করা হয়। নিম্নে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির দুটি আইনগত সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২ (১-ট) ধারায়** বলা হয়েছে, "প্রাইভেট কোম্পানি বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝাবে যা এর নিয়মাবলি অনুসারে সদস্য সংখ্যা ৫০ এ সীমিত রাখে, সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তরের অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান নিষিদ্ধ করে।"

- **১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ৩ ধারা** অনুসারে "প্রাইভেট কোম্পানি বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝায় যা পরিমেল নিয়মাবলি দ্বারা (ক) সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার সীমাবদ্ধ রাখে, (খ) সদস্য সংখ্যা ৫০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, (গ) জনগণের প্রতি শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের আহ্বান নিষিদ্ধ করে।"

সুতরাং কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট যে সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানি ৫০ এর অধিক সদস্য গ্রহণ করতে পারে না, জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না এবং অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে না তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্য
Characteristics of private limited company

ঘরোয়া প্রকৃতির সসীম দায়সম্পন্ন স্বাধীন ব্যবসায় সংগঠন হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। শেয়ার অহস্তান্তরযোগ্য এ ছোটো আকারের ব্যবসায় সংগঠনকে ঘরোয়া সসীম দায় কোম্পানি সংগঠনও বলে। এ প্রকৃতির সংগঠনের কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

১. **সদস্য সংখ্যা:** কমপক্ষে ২ জন ব্যক্তি প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করতে পারে। তবে এর সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হতে পারে না। সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হলে কিংবা ২ জনের নিচে হলে সেটি প্রাইভেট কোম্পানি রূপে গণ্য হবে না।
২. **শেয়ার বিক্রয়:** প্রাইভেট কোম্পানি বিবরণপত্র ইস্যু করে জনসাধারণকে শেযার ক্রয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। প্রাইভেট কোম্পানির জন্য জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ।
৩. **শেয়ার হস্তান্তর:** কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাইভেট কোম্পানির কোনো সদস্য তার ক্রীত শেয়ার অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে পারে না। এরূপ কোম্পানিকে শেয়ার হস্তান্তরের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়।
৪. **দায়:** প্রাইভেট কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। তাদের দায় শেয়ার দ্বারা অথবা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। প্রাইভেট কোম্পানি কখনো সীমাহীন দায়বিশিষ্ট হয় না।
৫. **পুঁজির সংস্থান:** প্রাইভেট কোম্পানি শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না বলে কোম্পানির সীমিত সংখ্যক সদস্যদেরকেই মূলধনের যোগান দিতে হয়।
৬. **প্রাইভেট লিমিটেড শব্দের ব্যবহার:** কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে প্রাইভোট কোম্পানির নামের শেষে প্রাইভেট লিমিটেড শব্দ দুটো যোগ করতে হয় ।
৭. **বিবরণপত্র প্রচার:** প্রাইভেট কোম্পানির বেলায় বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবরণপত্র প্রচার করা যায় না কিংবা তা নিবন্ধকের নিকট দাখিলও করতে হয় না
৮. **ন্যূনতম পুঁজি:** এ কোম্পানির বেলায় ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা নেই।
৯. **ব্যবসায়ের আরম্ভ:** নিবন্ধকের নিকট থেকে নিবন্ধনপত্র পেয়ে প্রাইভেট কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।
১০. **বিধিবদ্ধ সভা:** প্রাইভেট কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ সভা ডাকতে হয় না এবং নিবন্ধকের নিকট বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনও দাখিল করতে হয় না।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এ বৈশিষ্ট্যসমূহ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে এক পৃথক প্রকৃতির সংগঠন হিসেবে পরিচিত করেছে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শুধু কোম্পানি সংগঠনেরই নয় অংশীদারি ব্যবাসয়েরও অনেক সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম। এ কারণে সারা বিশ্বে এ সংগঠন জনপ্রিয় সংগঠন।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা

Advantages of private limited company

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় প্রাইভেট কোম্পানি কী কী বিশেষ সুবিধা ভোগ করে:

কতিপয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও গঠনগত, ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ, সভা আহ্বান, কার্যারম্ভ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এসব সুবিধা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **গঠনগত সুবিধা:** ন্যূনতম দুজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে প্রাইভেট কোম্পানি সহজেই গঠন করতে পারে। সহজ গঠনের জন্য এর জনপ্রিয়তাও অধিক।
২. **সীমিত দায়:** প্রাইভেট কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমিত বলে অসীম দায়বিশিষ্ট ব্যবসায়ের চেয়ে এর প্রতি বিনিয়োগকারীরা বেশি আকৃষ্ট হয়।
৩. **আইনগত সুবিধা:** এরূপ কোম্পানিকে আইনের জটিলতা তেমনটা পোহাতে হয় না। এ জাতীয় কোম্পানির গঠন ও পরিচালনায় আইনগত বিধিনিষেধ কড়াকড়িভাবে আরোপিত হয় না।
৪. **নিবন্ধন:** নিবন্ধনপত্র প্রাপ্তির পর পরই প্রাইভেট কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে। তাকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

৫. **ন্যূনতম পুঁজি থেকে মুক্তি:** ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ না করেই প্রাইভেট কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে। এরূপ কোম্পানির জন্য ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক নয় বিধায় উদ্যোক্তরা সহজেই ব্যবসায়ের দ্বার উদঘাটন করতে সক্ষম হয়।
৬. **বিধিবদ্ধ সভা হতে অব্যাহতি:** কোম্পানি আইন প্রাইভেট কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানের বিধান থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।
৭. **রূপান্তারের সুযোগ:** সদস্যগণের যদি স্বদিচ্ছা থাকে তাহলে পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাইভেট কোম্পানিকে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর করতে পারে (বিস্তারিত পরবর্তী পাঠে দেখুন)।
৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুত নমনীয়তা:** সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় প্রাইভেট কোম্পানি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
৯. **পলিসি সংক্রান্ত নমনীয়তা:** প্রাইভেট কোম্পানি সাধারণত আয়তনে ছোটো এবং স্বল্প সদস্যবিশিষ্ট বলে প্রয়োজনবোধে অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সহজেই পলিসি পরিবর্তন করতে পারে।
১০. **গোপনীয়তা রক্ষা:** কর্মীর সংখ্যা কম হওয়ায় এবং তাদের কার্যাবলির ওপর পরিচালকদের ব্যক্তিগত তদারক থাকার কারণে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়।
১১. **ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা:** পরিচালকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তাই কর্মীরা কাজে উৎসাহ পায়। এতে ব্যবস্থাপনারও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
১২. **পরিচালক সংখ্যা বৃদ্ধি:** প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকের সংখ্যা বাড়াতে হলে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।
১৩. **উদ্বৃত্তপত্র:** প্রাইভেট কোম্পানিকে প্রত্যেক সদস্য বা ঋণপত্রধারীর নিকট উদ্বৃত্তপত্র বা ব্যালেন্স শিট পাঠাতে হয়না।
১৪. **সূচি রক্ষণ:** আইন মোতাবেক প্রাইভেট কোম্পানির সদস্যদের জন্য কোনো সূচি রাখতে বাধ্য নয়।
১৫. **ঋণের সহজলভ্যতা:** এ কোম্পানিকে ঋণ দেওয়া নেয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে আইনের শাসন মানতে হয় না।

আলোচিত বিষয়সমূহ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে বিধায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অধিক হারে এ ধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অসুবিধা

Disadvantages of private limited company

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হয়

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কতগুলো ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এ অসুবিধাগুলো নিচে আলোচিত হলো:

১. **সদস্য সংখ্যার সীমাবদ্ধতা:** প্রাইভেট কোম্পানির সদস্য ৫০ জনের বেশি হতে পারে না। ফলে প্রয়োজন দেখা দিলেও অধিক সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা যায় না।
২. **পুঁজির অপ্রতুলতা:** সদস্য সংখ্যা সীমিত হওয়ায় প্রাইভেট কোম্পানি ইচ্ছেমত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পরে না। আর সীমিত সংখ্যক সদস্যের পক্ষেও বেশি পরিমাণে মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।
৩. **সম্প্রসারণের অসুবিধা:** পুঁজি প্রয়োজন মাফিক বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না বলে প্রাইভেট কোম্পানি অনেক সময় উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিশিষ্ট প্রকল্প হাতে নিতে পারে না। ফলে ব্যবসায়ের সম্প্রাসারণ ব্যাহত হয়।
৪. **শেয়ার হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা:** ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন মোতাবেক প্রাইভেট কোম্পানির সদস্যগণ শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে না। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।
৫. **শেয়ার বাজারে অতালিকাভুক্তি:** শেয়ার হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রাইভেট কোম্পানি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হতে পারে না।
৬. **হিসাবে কারচুপি:** প্রাইভেট কোম্পানিকে জনসাধারণ্যে হিসাব প্রকাশ করতে হয় না বলে হিসাবে কারচুপি করার সুযোগ থাকে। এরূপ কারচুপির দরুন আয়কর বিভাগ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৭. **অধিক স্বজনপ্রীতি:** প্রাইভেট কোম্পানিতে উদ্যোক্তা বা পরিচালকগণই সর্বেসর্বা। তাই কর্মচারী নিয়োগের সময় তারা স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিলেও কারো কিছু বলার থাকে না। এতে কোম্পানিতে অদক্ষ কর্মীর অনুপ্রবেশ ঘটে।

৮. **আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণঃ** প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালকগণ ইচ্ছে করলে হিসাবপত্রে গোজামিল দিয়ে বা কারচুপি করে সরকারকে আয়কর ফাঁকি দিতে পারে। ফলে তাদের হাতে অবাঞ্ছিত অর্থের সমাগম ঘটে এবং আর্থিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের কারণে কখনো কখনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে।

সারসংক্ষেপ

সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোনো কোম্পানি যদি ২ থেকে ৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর করার অধিকার সীমাবদ্ধ করে দেয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। তুলনামূলকভাবে এরূপ কোম্পানি ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে এবং একে কঠোর আইনগত নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই দেওয়া হয়। এ প্রকৃতির সংগঠনের কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এ বৈশিষ্ট্যসমূহ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে এক পৃথক প্রকৃতির সংগঠন হিসেবে পরিচিত করেছে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শুধু কোম্পানি সংগঠনেরই নয় অংশীদারি ব্যবাসয়েরও অনেক সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম। এ কারণে সারা বিশ্বে এ সংগঠন জনপ্রিয় সংগঠন। কতিপয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও গঠনগত, ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ, সভা আহ্বান, কার্যারম্ভ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ ধরনের কোম্পানি কতগুলো ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এসব অসুবিধাসমূহের কারণে কখনো কখনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে।

পাঠ ৬.৪ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
Public Limited Company

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী বলতে পারবেন।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারবেন।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করার পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- কোম্পানির নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দের ব্যবহারের কারণ বলতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা প্রাইভেট কোম্পানি নিয়ে আলোচনাকালে দেখেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের কোম্পানিগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে, প্রাইভেট কোম্পানি বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট এবং সংগ্রহ করতে পারেনা। স্বাভাবিকভাবেই বড় বিনিয়োগের অভাবে বৃহদায়তনে ব্যবসায় সম্প্রসারণে সুযোগ সীমিত থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এ অসুবিধাগুলো খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। আসুন জেনে নিই, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্য, এর সুবিধা-অসুবিধাসহ অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সংজ্ঞা
Definition of public limited company

যে কোম্পানি কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ যে কোনো সংখ্যক সদস্যসহ সীমিত দায়ের ভিত্তিতে অবাধে শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক কোম্পানির সদস্য যে কোনো সংখ্যক হতে পারে - এ ব্যাপারে কোনো আইনগত বিধিনিষেধ নাই। এ কোম্পানি জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। নিবন্ধনের পর পাবলিক কোম্পানিকে ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য নিবন্ধকের কাছ থেকে 'কার্যারম্ভের অনুমতি' নিতে হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংক্ষেপে পাবলিক কোম্পানি নামেও পরিচিত। আসুন দেখে নিই বাংলাদেশ ও ভারতের আইনে এ ব্যবসায়কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঞ) ধারায়** বলা হয়েছে, "পাবলিক কোম্পানি বলতে এ আইনে বা এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোনো আইনের অধীনে নিগমিত (incorporated) এমন কোনো কোম্পানিকে বোঝাবে যা প্রাইভেট কোম্পানি নয়।"
- **১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ৩(১-iv) ধারায়** বলা হয়েছে, "প্রাইভেট কোম্পানি নয় এরূপ কোম্পানিকেই পাবলিক কোম্পানি বলে।" (A public company is one which is not a private company.)

সুতরাং আমরা বলতে পারি, পাবলিক কোম্পানি হলো সেই কোম্পানি যা জনগণের নিকট শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, যার সদস্য সংখ্যা অধিক এবং সদস্যদের দায় ক্রীত শেয়ার এর মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ । সদস্য সংখ্যা অধিক হওয়ায় একে ব্যাপক মালিকানার যৌথমূলধনী ব্যবসায়ও বলা হয়।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্য

Characteristics of public limited company

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সীমিত দায় সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট একটি সংগঠন। এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে একে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। নিম্নে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হলো:

১. **আইনসৃষ্ট সংগঠন:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। আইনের বিধান মতে একে সর্বক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে হয়।

২. **কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা:** এ ধরনের কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। এটি একজন মানুষের মতোই চুক্তি সম্পাদন করতে পারে ও অন্যের নামে মামলা করতে পারে।

৩. **চিরন্তন অস্তিত্ব:** পাবলিক কোম্পানি চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। শেয়ার হস্তান্তরিত হলে, শেয়ারহোল্ডার দেউলিয়া হলে, এমনকি শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু হলেও কোম্পানির অবসান হয় না।

৪. **সিলমোহরের ব্যবহার:** এ কোম্পানি নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করতে পারে। আইনই তাকে এ বৈধতা প্রদান করেছে।

৫. **সীমিত দায়:** পাবলিক কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক সদস্য যত টাকার শেয়ার কিনবে ঠিক ততো টাকা পর্যন্ত দায় সীমিত থাকবে।

৬. **সদস্য সংখ্যা:** এ কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সবোর্চ্চ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। আইনে সদস্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা বেঁধে দেওয়া নেই।

৭. **শেয়ার মূলধন:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তার প্রত্যাশিত সমগ্র মূলধনকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করে। প্রতিটি অংশকে এক একটি শেয়ার বলে। শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে এ কোম্পানি তার মূলধনের সংস্থান করে থাকে।

৮. **শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা:** এ কোম্পানির শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। যে কোনো সদস্য যে কোনো সময় তার শেয়ার নিয়ম মাফিক অন্যের নিকট বিক্রি করতে পারে।

৯. **শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ:** পাবলিক কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচার করে জনগণকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

১০. **ন্যূনতম পুঁজি:** পাবলিক কোম্পানিকে কার্যারম্ভের পূর্বে ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ করতে হয়।

১১. **কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র:** ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা পাবলিক কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক।

১২. **লিমিটেড শব্দের ব্যবহার:** এ ধরনের কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

১৩. **বিবরণ প্রকাশ:** পাবলিক কোম্পনিকে বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবরণপত্র প্রকাশ করতে হয়।

১৪. **পরিচালক সংখ্যা:** এর পরিচালক সংখ্যা কমপক্ষে ৩জন হতে হয়।

১৫. **বিধিবদ্ধ সভা:** পাবলিক কোম্পানির পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক।

১৬. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পরিচালক নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলে। ফলে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ কম থাকে।

১৭. **হিসাব দাখিল:** পাবলিক কোম্পানিকে বার্ষিক হিসাবপত্রাদি নিবন্ধকের নিকট বাধ্যতামূলকভাবেই দাখিল করতে হয়।

ওপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকলে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে অভিহিত করা যায়।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সুবিধাসমূহ

Advantages of public limited company

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বিশেষ সুবিধা

বৃহদায়তন সংগঠন হিসেবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি হিসেবে এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ সংগঠনটির কতিপয় সুবিধা পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবৃত হলো:

১. **সীমিত দায়:** পাবলিক কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক সদস্য যত টাকার শেয়ার কিনবে, ঠিক তত টাকা পর্যন্ত দায় সীমিত থাকবে। ফলে জনগণ এতে নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পারে।
২. **অধিক সংখ্যক সদস্য:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে অধিক সংখ্যক সদস্য রাখার সুযোগ রয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা নিম্নে ৭ জন এবং ঊর্ধ্বে স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৩. **মূলধনের পর্যাপ্ততা:** মূলধনের পর্যাপ্ততা এ কোম্পানির একটি বড় ধরনের সুবিধা। আবার জনগণের নিকট শেয়ার বা ঋণপত্র বিলি করেও মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।
৪. **বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার ফলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা লাভ করতে পারে। যেমন- অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা, ব্যয় হ্রাস করার সুযোগ ইত্যাদি।
৫. **ব্যাপক উৎপাদন:** পর্যাপ্ত মূলধন ও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা থাকায় এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাপক উৎপাদন কার্য সহজ হয়। এ কারণেই অনেকে এ ধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।
৬. **শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়:** পাবলিক কোম্পানি জনসাধারণের নিকট শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে। ফলে যে কোনো ব্যক্তি এ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিক হবার গৌরব অর্জন করতে পারে।
৭. **দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি থাকায় পাবলিক কোম্পানি অধিক অর্থ ব্যয়ে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে পারে। এতে কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য দক্ষতার সাথে সম্পাদিত হতে পারে।
৮. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা:** পাবলিক কোম্পানির সদস্যরা তাদের শেয়ার অবাধে হস্তান্তর বা অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারে। এর জন্য কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।
৯. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** বৃহদায়তন সুবিধা থাকায় এ কোম্পানিতে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, যা দেশে বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক।
১০. **ঝুঁকি বণ্টন:** এ কোম্পানির ঝুঁকি ও দায়সমুহ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনের সুযোগ রয়েছে। ফলে এর শেয়ার ক্রয় করে অনেকেই কোম্পানির মালিকানা লাভে আগ্রহী হয়ে উঠেন।
১১. **জনগণের আস্থা:** অধিক সদস্য, আর্থিক সঙ্গতি, চিরন্তন অস্তিত্ব ইত্যাদি কারণে এর প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণ এ জাতীয় কোম্পানিতে অধিক বিনিয়োগে উৎসাহ বোধ করেন।
১২. **ঋণের সুবিধা:** চিরন্তন অস্তিত্ব, পৃথক আইনগত সত্তা, ব্যাপক উৎপাদন ইত্যাদি সুবিধা থাকায় পাবলিক কোম্পানি যে কোনো ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো উৎস হতে সহজেই ঋণ পায়। একই কারণে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য ঋণপত্র ইস্যু করেও এ কোম্পানি ইতিবাচক সাড়া পেয়ে থাকে।
১৩. **সম্প্রসারণের সুযোগ:** মূলধনের আধিক্য, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় দক্ষতা এবং জনগণের আস্থা ইত্যাদি কারণে এ কোম্পানির সম্প্রাসারণ এর সুযোগ অধিক।
১৪. **গণতান্ত্রিক নীতি:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পরিচালক নির্বাচনে ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে থাকে, যা এর আরও একটি সুবিধাজনক দিক।
১৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বৃহদায়তন উৎপাদন, বণ্টন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় পাবলিক কোম্পানি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সামাজিক কল্যাণ সাধন, সঞ্চয়ে উৎসাহ দান, জালিয়াতি রোধের সুযোগ ইত্যাদি সুবিধাজনক দিক রয়েছে। আর এগুলো একটি দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অসুবিধাসমূহ

Disadvantages of public limited company

শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা, অধিক সংখ্যক সদস্য ইত্যাদি কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নীত করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে এর অসুবিধাও রয়েছে। এগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলো ধরা হলো:

১. **জটিল গঠনপ্রণালি:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির গঠন কিছুটা জটিল প্রকৃতির। এতে আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বেশি। ফলে অনেকেই কোম্পানি গঠনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

২. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:** এরূপ কোম্পানি বৃহদায়তন হওয়ায় বহুবিধ আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বিধায় অনেক সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

৩. **স্বজনপ্রীতি:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কিছু সংখ্যক পরিচালকের হাতে ন্যস্ত থাকে। অনেক সময়েই তারা শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এত ব্যবসায়ে দক্ষতা হ্রাস পায়।

৪. **ব্যয় বহুল:** বৃহদায়তনের এ ব্যবসায় সংগঠন পরিচালনা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক যেমন- সভা অনুষ্ঠান, হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ কারণে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়।

৫. **ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা:** এ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একজন বেতনভুক্ত কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত থাকায় কোম্পানির পরিচালনায় অদক্ষতাসহ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি দেখা দেয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা বিরাজ করে।

৬. **ন্যূনতম চাঁদা:** পাবলিক কোম্পানির শেয়ার বণ্টন ও কার্যারম্ভের পূর্বে পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লিখিত ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহ করতে হয়। নতুবা কোম্পানি কার্য আরম্ভ করতে পারে না।

৭. **কার্যারম্ভে বিলম্ব:** পাবলিক কোম্পানি বিনন্ধন পাবার সাথে সাথে ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে না। ব্যবসায় শুরু করতে হলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এতে কার্যারম্ভে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

৮. **আইনের কঠোরতা:** এ কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে আইনগত বিধি-বিধান অত্যন্ত কঠিনভাবে পালন করতে হয় যা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পরিচালনা ও এর বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৯. **ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের অভাব:** ব্যবস্থাপনা মালিকানা থেকে পৃথক হওয়ায় মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকার দরুন মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রায়শই বিরোধ লেগে থাকে।

১০. **একচেটিয়া ব্যবসায়:** বৃহদায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার কারণে এর মাধ্যমে অনেক সময়ই একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় যা সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যবসায় উন্নয়নের পথকে করে সীমিত।

১১. **ব্যক্তিগত উৎসাহের অভাব:** এরুপ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গুটি কয়েক পরিচালকের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক হয়েও এর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে অনেকেই ব্যবসায়ে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী হয় না।

১২. **গোপনীয়তা রক্ষার অসুবিধা:** পাবলিক কোম্পানিকে আইন অনুযায়ী বার্ষিক লাভ-ক্ষতি ও উদ্বৃত্তপত্রের অনুলিপি ও অন্যান্য দলিলপত্র কোম্পানির নিবন্ধক ও শেয়ারহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করতে হয়। এর ফলে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বহুবিধ সুবিধা থাকলেও উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের কারণে কেউ কেউ এতে বিনিয়োগের তেমন আগ্রহ বোধ করে না।

প্রাইভেট কোম্পানিকে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর

Conversion of private company into public company

বৃহদায়তন উৎপাদন, অধিক মূলধন, শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা ইত্যাদি কতিপয় ক্ষেত্রে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। ফলে কখনো কখনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর ২৩১ ধারায় প্রাইভেট কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের বিধান বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী এ রূপান্তরের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়:

- **বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** কোম্পানি আইনের ২(১-ট) ধারা অনুযায়ী প্রাইভেট কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা পরিবর্তন করার জন্য সর্ব প্রথম বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।
- **পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন:** কোম্পানি আইনের ২(১-ট) ধারায় প্রাইভেট কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে যেসব ধারায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়:
    ক. সদস্য সংখ্যা ৫০ এ সীমাবদ্ধ
    খ. শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়;
    গ. জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিমেল নিয়মাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়:

ক. সদস্য সংখ্যা কোম্পানির মোট শেয়ার সংখ্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ;
খ. শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য;
গ. জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়যোগ্য।

অনুরূপভাবে পরিমেল নিয়মাবলির অন্য কোনো বিধান পাবলিক কোম্পানির পরিপন্থী হলে সেগুলোও পরিবর্তন করাতে হবে।

- **দলিলপত্র দাখিল:** নিম্নলিখিত দলিলপত্র রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।
    ক. বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি ও সংশোধিত পরিমেল নিয়মাবলি;
    খ. পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের ত্রিশ দিনের মধ্যে কোম্পানির একটি প্রসপেক্টাস দাখিল করতে হবে। প্রসপেক্টাসের পরিবর্তে অবশ্য একটি "প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী" ও দাখিল করা যেতে পারে। কোম্পানি আইনের ৫ম তফসিলের ১ম খণ্ডে এরূপ বিকল্প বিবরণী সম্পর্কিত বিষয়াদি উল্লেখ আছে।
- **সদস্য ও পরিচালক সংখ্যা পরিবর্তন:** সদস্য সংখ্যা ৭ জনের কম থাকলে কমপক্ষে তা ৭ এ উন্নীত করতে হবে। তেমনি পরিচালকের সংখ্যা ৩ জনের কম থাকলে অন্তত ৩ এ উন্নীত করতে হবে।
- **লিমিটেড শব্দ পরিবর্তন:** কোম্পানির স্মারকলিপির "নাম ধারা" -তে লিখিত প্রাইভেট লিমিটেড শব্দের পরিবর্তে কেবল লিমিটেড শব্দ লিখতে হবে।

উপরিউক্ত নিয়মাবলি পালিত হলে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের তারিখ হতেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করতে পারে।

কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দের ব্যবহার

Use of the word 'Limited' after the name of a company

কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। তবে সীমাহীন দায় বিশিষ্ট কোম্পানির ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, এমন সসীম দায়বিশিষ্ট কোম্পানি সরকারের অনুমতি নিয়ে নামের শেষে লিমিটেড শব্দ ব্যবহার না করলেও পারে। কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যারা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবে তারা শুধুমাত্র শেয়ারের আংকিক মূল্য পর্যন্ত কোম্পানির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

সারসংক্ষেপ

যে কোম্পানি কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ যে কোনো সংখ্যক সদস্যসহ সীমিত দায়ের ভিত্তিতে অবাধে শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সীমিত দায় সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট একটি সংগঠন। এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে একে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ সংগঠনটির কতিপয় সুবিধা যেমন রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে।

পাঠ ৬.৫ কোম্পানির গঠন
Formation of Company

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কোম্পানির গঠনপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোম্পানির প্রবর্তক ও এর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্মারকলিপি কী, এর বিষয়বস্তু ও পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিমেল নিয়মাবলি ও এর এর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিবরণপত্র কী, বিষয়বস্তু এবং বিকল্প বিবৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নিবন্ধনপত্র, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ও পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কোম্পানি গঠন করার ক্ষেত্রে কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এসব নিয়ম মেনে ধারাবাহিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। কোম্পানি আইন অনুযায়ী "যৌথমূলধনী কোম্পানিসমূহের নিবন্ধক" কর্তৃক প্রণীত কিছু ফরম পূরণ করার প্রয়োজন হয়। যেভাবে খুশি সেভাবে কোম্পানি গঠন করা যায় না এবং যখন ইচ্ছা হয় তখনই কোম্পানি ব্যবসায়ও শুরু করা যায় না। সব কিছুই বিধি ও নিয়মের আওতাধীন। এ পাঠে কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

কোম্পানির গঠনপ্রণালি
Formation procedure of company

কোম্পানি সংগঠনের গঠনপ্রণালী অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। কোম্পানি গঠনের সাথে অনেক আইনগত আনুষ্ঠানিকতা জড়িত থাকে। বাংলাদেশের কোম্পানি সংগঠনসমূহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোম্পানি গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নোক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হলো:

১. উদ্যোগ গ্রহণ
২. পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩. প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রণয়ন
৪. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ
৫. নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ
৬. নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ
৭. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ

১. **উদ্যোগ গ্রহণ (Taking initiative):** একাধিক ব্যক্তি কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। কোম্পানি গঠনের জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ের সম্ভাবনা, সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তারা কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

২. **পরিকল্পনা প্রণয়ন (Making a plan):** উদ্যোগ গ্রহণ শেষে উদ্যোক্তাগণ কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে একটি গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক মূলধন, সম্ভাব্য প্রাথমিক খরচাদি, শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা, শেয়ারের সংখ্যা, শেয়ারেরমূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৩. **প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রণয়ন (Preparing essential documents)**: পরিকল্পনা তৈরির পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির জন্য নিম্নে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসমূহ প্রণয়ন করেন:

ক. স্মারকলিপি সংঘস্মারক বা পরিমেলবন্ধ (Memorandum of association): এটি কোম্পানির মূল দলিল বা সনদ । এ দলিলে কোম্পানির নাম, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা, কোম্পানির মূল লক্ষ্যসমূহ, শেয়ার, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারের আংকিক মূল্যসহ মূলধনের বিভক্তি এবং এটি প্রাইভেট লিমিটেড নাকি পাবলিক লিমিটেড তা উল্লেখ করা আবশ্যক।

খ. সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of association): এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিবিধান অর্থাৎ কোম্পানি কীভাবে পরিচালিত হবে তা উল্লেখ থাকে। অবশ্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল (১) -কে কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে দলিল তৈরির প্রয়োজন হয় না।

৪. **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ (Collection of essential documents)**: এ পর্যায়ে উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধকের অফিস থেকে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক কোম্পানি নিবন্ধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ফরম ও কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।

৫. **নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ (Step for registration)**: কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য এ পর্যায়ে বিভিন্ন ফরমগুলো যথাযথভাবে পূরণ করার পর উদ্যোক্তরা কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলগুলো নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়:

ক. পরিমেলবন্ধ বা সংঘস্মারকের অনুলিপি। পরিমেলবন্ধে প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জনের এবং পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে ৭ জনের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।

খ. পরিমেল নিয়মাবলির অনুলিপি। এতেও পূর্বোক্ত নিয়মে উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষর থাকতে হয়। তবে কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল-১ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে এ মর্মে ঘোষণাপত্র উদ্যোক্তাগণকে দাখিল করতে হয়।

গ. কোম্পানি আইনের বিধিবিধান পালন করা হয়েছে- এ মর্মে একটি ঘোষণাপত্র। এ ঘোষণাপত্রটি কোনো উকিল, আয়কর উপদেষ্টা বা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা প্রত্যয়ন করে নিতে হয় [ধারা ২৫(২)]

ঘ. কোম্পানির পরিচালক হবার জন্য সম্মতি প্রদাণকারী ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা [ধারা ৯২(২)]

ঙ. পরিচালক হিসেবে কাজ করতে সম্মত আছেন এ মর্মে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র [ধারা ৯২(১)]

চ. পরিচালক হিসেবে কোম্পানির নিকট থেকে যোগ্যতামূচক শেয়ার ক্রয়ে সম্মত আছেন এ মর্মে একটি লিখিত চুক্তিপত্র [ধারা ৯২(১-খ)]

৬. **নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ (Collection of the certificate of incorporation)**: প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করার পর তিনি যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোম্পানি আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তাহলে তিনি কোম্পানির নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর প্রাইভেট কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে; কিন্তু পাবলিক কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে না।

৭. **কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ (Collection of certificate of commencement)**: এ পদক্ষেপটি শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য। এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে কোম্পানির বিবরণপত্র তৈরি করে জনগণকে শেযার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানান। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৫০ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দলিলগুলো পুনরায় সংযুক্ত করতে হয়:

ক. ন্যূনতম মূলধন সংগৃহীত হয়েছে এবং প্রত্যেক পরিচালক তার ক্রীত শেয়ারের মূল্য প্রদান করেছেন এ মর্মে ঘোষণাপত্র [ধারা ১৫০(১)]।

খ. পরিচালকদের নিজেদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হলে সেক্ষেত্রে কোম্পানি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার না করে থাকলে বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিকল্প বিবরণির কপি [ধারা-১৫০ (১-ঘ)]।

ওপরে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে দলিলপত্র দেখেশুনে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তবে তিনি কোম্পানির নামে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ইস্যু করেন। অতপর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌথমূলধনী কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে।

কোম্পানির প্রবর্তক

Promoter of a company

কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাদেরকেই কোম্পানির উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলে। প্রবর্তক কোম্পানি স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং কোম্পানির কার্য শুরু হওয়া অবধি যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

প্রবর্তক এর দুটো জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- **Justice Cockburn** (বিচারপতি ককবার্ণ) এর অভিমত অনুযায়ী, "প্রবর্তক এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি প্রকল্প বাস্তাবায়নের প্রসঙ্গে কোম্পানি গঠন করেন এবং এটা পরিচালনা করেন ও ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।" [Promoter is one who undertakes to form company with reference to a given project and to set it going and who takes the mecessary steps to accomplish that purpose.]
- **Sir Francis Palmar** (স্যার ফ্রান্সিস পামার)-এর সংজ্ঞা অনুসারে, "যে ব্যক্তি কোম্পানির সুযোগ সুবিধা, মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে একটি সুদির্নিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, প্রস্তাবিত কোম্পানির স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলি ও অন্যান্য দলিলপত্র প্রণয়ন করে নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে, প্রাথমিক ব্যয় বহন করে, নিবন্ধন পূর্ব চুক্তিসমূহের শর্তাবলি নির্ধারণ করে, প্রাথমিক পরিচালক নির্বাচন করে বিবরণপত্র প্রণয়ন ও প্রচার করে এবং মূলধন সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য করে তাকে প্রবর্তক বলে।"

সুতরাং বলা যায়, কোম্পানির প্রবর্তক এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো কোম্পানি গঠনের পরিকল্পনা করেন এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্য পদ্ধতি গ্রহণে সচেষ্ট হন।

প্রবর্তকের শ্রেণিবিভাগ

Classification of promoters

প্রবর্তক হচ্ছে এমন ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যারা কোম্পানি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির কার্য শুরু হওয়া অবধি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। উদ্যোক্তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রবর্তককে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এ শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **পেশাদার প্রবর্তক (Professional promoter):** যে প্রবর্তক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোম্পানি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে পেশাদার প্রবর্তক বলে। এরূপ প্রবর্তক কোম্পানি গঠনের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এ শ্রেণির প্রবর্তকগণ দক্ষ, অভিজ্ঞ হয়ে থাকে।

২. **সাধারণ প্রবর্তক (Ordinary promoter):** কতিপয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যৌথভাবে কোনো কোম্পানি গঠন করলে তাদেরকে সাধারণ প্রবর্তক বলে। কোম্পানি মালিক ও পরিচালক এ শ্রেণির প্রবর্তক। বাংলাদেশের অধিকাংশ কোম্পানি এ ধরনের প্রবর্তকদের দ্বারা গঠিত।

১. **সাময়িক প্রবর্তক (Occassional promoter):** সাময়িকভাবে বা কোনো বিশেষ কারণবশত যখন কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তাদেরকে সাময়িক প্রবর্তক বলে। শুধুমাত্র সাময়িকভাবে কোম্পানি প্রবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করাই এ শ্রেণির প্রবর্তকের কাজ।

স্মারকলিপি/সংঘস্মারক/পরিমেলবন্ধ এর সংজ্ঞা

Definition of Memorandum of association

কোম্পানির নাম, অবস্থান, উদ্দেশ্য, সদস্যদের পুঁজির পরিমাণ, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদির বিবরণসহ কোম্পানির ক্ষমতার সীমা নির্দেশক দলিলকে স্মারকলিপি বলে। স্মারকলিপি কোম্পানির গঠণতন্ত্রস্বরূপ। একে কোম্পানির সনদ বা সংবিধানও বলা হয়। এটি সংঘস্মারক বা পরিমেলবন্ধ হিসেবেও পরিচিত।

স্মারকলিপি কোম্পানি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে কোম্পানির কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করা। স্মারকলিপিতে যে ক্ষমতা দেওয়া থাকে কোম্পানি কখনো সে ক্ষমতার বাহিরে কোনো কাজ করতে পারে না। স্মারকলিপি সম্পর্কে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখিত হলো:

- **চার্লস ওয়ার্থ** (Charles Worth): "স্মারকলিপি হচ্ছে নিবন্ধিত কোম্পানির সনদ যা কোম্পানির ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে।"
- **বিচারপতি লর্ড কেয়ার্নস** (Lord Cairns): "স্মারকলিপি হচ্ছে কোম্পানির সনদ এবং এটি কোম্পানি আইনের বলে গঠিত কোম্পানির ক্ষমতা সীমা নির্দেশ করে।" [The Memorandum of association of a company is its charter and defines the limitations of the powers of the company established under the company act.]

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, কোম্পানির উদ্দেশ্য, দায়দায়িত্ব, কার্যাবলি, নিবন্ধন শর্তাবলি, ক্ষমতার সীমা ও সামগ্রিক কাঠামো নির্দেশকারী দলিলকে (বা সংবিধানকে) স্মারকলিপি বলা হয়।

স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বা ধারাসমূহ ও নমুনা

Contents/Clauses and Specimen of memorandum of association

কোম্পানি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণদলিল স্মারকলিপি। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৬,৭ও ৮ ধারায় যথাক্রমে শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি, প্রতিশ্রুতি (বা গ্যারান্টি) দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি ও অসীম দায় কোম্পানির স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানির স্মারকলিপির বিভিন্ন ধারায় উল্লিখিত বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো:

১. নাম ধারা (**Name clause**): শেয়ার বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড (Limited বা Ltd.) শব্দটি যোগ করতে হয়। সীমাহীন দায়সম্পন্ন কোম্পানির বেলায় শুধু নাম উল্লেখ করলেই চলে। চলতি কোনো কোম্পানির নামের সাথে মিল রেখে কোনো কোম্পানির নাম রাখা যাবে না। এছাড়া দেশের রাজা, রানী, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতির প্রতিষ্ঠাতা, সরকারি গেজেট ঘোষিত অনভিপ্রেত নাম কিংবা জাতিসংঘ বা বিশ্ব সংস্থার সহায়ক কোনো সংস্থার নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করা যাবে না।

২. অবস্থান ও ঠিকানা ধারা (**Location and address clause**): কোম্পানির নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান ও ঠিকানা এ ধারায় উল্লেখ করতে হয়। কোম্পানি বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে সব এলাকায় ব্যবসায় পরিচালনা করবে তাও এ ধারায় উল্লেখ করতে হয়।

৩. উদ্দেশ্য ধারা (**Objects clause**): এ ধারায় কোম্পানির কর্মপরিধি ও অধিকারের সীমা নির্ধারিত আছে। কোম্পানি কী ধরনের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকবে, ভবিষ্যতে যে সব ব্যবসায় পরিচালনা করবে, যে সব কার্যক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ এ ধারায় উল্লেখ থাকে। এ কারণে স্মারকলিপির এ ধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. মূলধন ধারা (**Capital clause**): এ ধারায় কোম্পানি যে শেয়ার মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছে তার পরিমাণ এবং শেয়ারের মূল্যমান কী হবে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের প্রতিশ্রুত অর্থের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা আবশ্যক।

৫. দায় ধারা (**Liability clause**): কোম্পানির শেয়াহোল্ডারদের দায়ের প্রকৃত কিরুপ হবে তা এধারায় উল্লিখিত হয়। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের দায় শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য (face value) দ্বারা সীমাবদ্ধ, না প্রতিশ্রুত দ্বারা সীমাবদ্ধ, না কি অসীম দায়বিশিষ্ট তা এ ধারায় লিপিবদ্ধ থেকে।

৬. সম্মতি ধারা (**Consent clause**): স্মারকলিপির সর্বশেষ অংশে কোম্পানির পরিচালক সদস্যদের এমন ঘোষণা প্রদান করতে হয় যে, তারা যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ে এবং স্মারকলিপির বর্ণনামতে কোম্পানি গঠনে সম্মত আছেন। এতে প্রত্যেক পরিচালকদের নাম ঠিকানা, সাক্ষীর সামনে প্রদত্ত স্বাক্ষর ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়।

স্মারকলিপি আইন অনুযায়ী প্রণীত হয় বিধায় এর পরিবর্তনও যথেষ্ট জটিলতাপূর্ণ। সুতরাং স্মারকলিপিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে ও যথেষ্ট সাবধানতার সাথে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

নমুনা

স্মারকলিপি
বাংলা প্রকাশনী লিমিটেড
১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রণীত

১. **কোম্পানির নাম:** বাংলা প্রকাশনী লিমিটেড
২. **কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস:** ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৩. **কোম্পানি গঠণের উদ্দেশ্য:**
   ক. পুস্তকাদি, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ।
   খ. প্রিন্টিং ও ছাপার কাজের জন্য মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয়, স্থাপন ও পরিচালনা।
   গ. মুদ্রণের কালি, কাগজ, ছাপার টাইপ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রস্তুত, বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা।
   ঘ. প্রকাশনা শিল্পের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য।
৪. **কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকা:** কোম্পানির কার্যক্রম সারা বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপৃত থাকবে।
৫. **সদস্যদের দায়:** কোম্পানির সকল সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ।
৬. **মূলধন:** কোম্পানির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ দশ কোটি টাকা, মূলধন প্রতিটি ১,০০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এ মর্মে সম্মতি প্রদান করছি যে, স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শর্তানুসারে একটি কোম্পানি গঠন করতে ইচ্ছুক এবং আমাদের নামের ডান পাশে প্রত্যেকের নামে যে অংকের শেয়ার ধার্য করা হয়েছে তা ক্রয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্মতি দানকারীদের নাম, ঠিকানা ও পেশা	ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা	ক্রয়েচ্ছু শেয়ার মূলধনের পরিমাণ (প্রতিটি ১০০ টাকা)	স্বাক্ষর
১. নাহার জাহিদ ৩২, শেরশাহ সুরী বোড, ঢাকা পেশা: শিক্ষকতা	৩,০০০	৩,০০,০০০	*nahar*
২. আলমগীর হোসেন ১৩/বি, ৫/৩০ মিরপুর, ঢাকা পেশা: চাকরি	৩,০০০	৩,০০,০০০	*Al. hossen*
৩. নজরুল আলম খারিশপুর, খুলনা পেশা: প্রকৌশলী	২,০০০	২,০০,০০০	*Nazrul*
৪. রোকসানা বেগম রুবি ৮০/১, মধ্যপাইক পাড়া, মিরপুর, ঢাকা পেশা: হস্ত শিল্পী	১,০০০	১,০০,০০০	রোকসানারুবি
৫. রেহানা ইসলাম রিনি ৬/এ-৯, বাজার রোড, জয়েন্ট কোয়ার্টার, ঢাকা পেশা: শিক্ষক	৫০০	৫০,০০০	*rehanairimi*
৬. আবু হোসেন লাবু ঠিকানা-ঐ পেশাঃ ঠিকাদারি	৫০০	৫০,০০০	*labu*
৭. মোঃ মানুন চৌধুরী ৫-বি, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা পেশা: ব্যবসায়	৫০০	৫০,০০০	***Manun***

স্মারকলিপি পরিবর্তন

Alteration of memorandum of association

কোম্পানি সংগঠনের গঠনতন্ত্র বা মূলসনদ হচ্ছে এর স্মারকলিপি। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুসারে আদালতের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে স্মারকলিপির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা যায়। নিম্নোক্ত যে কোনো কারণে স্মারকলিপি পরিবর্তন করা যায়:

i. অধিক মিতব্যয়িতার সাথে বা অধিক দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য;
ii. নতুন বা অধিক কার্যকর উপায়ে ব্যবসায়ের লক্ষ্যার্জনের জন্য;
iii. ব্যবসায়ের কার্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের জন্য;
iv. কোনো লাভজনক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য;
v. স্মারকলিপির কোনো উদ্দেশ্য ত্যাগ বা সংকোচনের জন্য;
vi. কোম্পানির সমস্ত অংশ বা কোনো অংশ বিক্রয় করার জন্য;
vii. অন্য কোনো কোম্পানির অথবা সংস্থার সাথে একীভূত হওয়ার জন্য।

স্মারকলিপির বিভিন্ন ধারা পরিবর্তনের জন্য যেসব নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয় তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

১. **নাম ধারা পরিবর্তন (Alternation of name of clause):** নাম ধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়-
   ক. শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় কোম্পানির নাম পবির্তনের জন্য একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   খ. নিবন্ধকের লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ
   গ. কোম্পনির পরিবর্তিত নামে নিয়মিতকরণের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ [ধারা ১১(৬) এবং ১১(৭)]

২. **অবস্থান ধারার পরিবর্তন (Alternation of situation clause):** কোম্পানির অবস্থান ধারার পরিবর্তন করতে হলে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় তা হচ্ছে-
   ক. শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করাতে হয়;
   খ. আদালত থেকে এ মর্মে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে;
   গ. এ পরিবর্তনের বিষয়টি নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধন করাতে হবে। [ধারা ১২(১) এবং ১২(২)]

৩. **উদ্দেশ্য ধারার পরিবর্তন (Alteration of object clause):** উদ্দেশ্য ধারা পরিবর্তন করতে হলে-
   ক. কোম্পানির সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।
   খ. এরূপ পরিবর্তন আদালত কর্তৃক অনুমোদন করাতে হয়।
   গ. কোম্পানির পরিবর্তিত স্মারকলিপির একটি মুদ্রিত কপি এবং আদালতের অনুমোদন আদেশের সত্যায়িত কপি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।

   উক্ত পরিবর্তন নিবন্ধভুক্তির পর কার্যকর হবে। [ধারা ১২(১), ১২(২), ১২(৩) এবং ১৫]

৪. **মূলধন ধারার পরিবর্তন (Alteration of capital clause):** কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধান থাকলে সহজেই কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়। মূলধন পরিবর্তনের বিধানগুলো নিম্নরূপ-
   ক. মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে: কোম্পানির সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লেখ থাকলে সাধারণ সভায় সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে। মূলধন বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত নোটিশ নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।
   খ. মূলধন হ্রাসের ক্ষেত্রে: পরিমেল নিয়মাবলিতে বিধান থাকলে মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করতে হলে শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর ১৫ দিনের মধ্যে তা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।

   উল্লেখ্য, পরিমেল নিয়মাবলিতে মূলধন হ্রাস বা বৃদ্ধির বিষয়ে বিধান না থাকলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে মূলধনের যে কোনো পরিবর্তন আনা যায়। এরূপ পরিবর্তনের বিষয় ১ মাসের মধ্যে নিবন্ধককে জানাতে হয়।। [ধারা ৫৩, ৫৬,৫৯]

৫. **দায় ধারার পরিবর্তন (Alteration of the liability clause):** কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে বিধান থাকলে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানি বিশেষ প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে তার পরিচালকদের দায়দায়িত্ব অসীম করার লক্ষ্যে কোম্পানি স্মারকলিপির পরিবর্তন করতে পারে। [ধারা ৭৬(১)]

সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি এবং এর বিষয়বস্তু

Articles of association and its contents

কোম্পানির যে দলিলে এর অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি পারিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি বা বিধি-উপবিধি লিপিবিদ্ধ থাকে তাকে পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘবিধি বলা হয়। এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল যা কোম্পানি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। নিম্নে পরিমেল নিয়মাবলির দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-প) ধারায়** বলা হয়েছে, "সংঘবিধি বলতে তফসিল-১ এ বিবৃত যতটুকু কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ততটুকু ঐ কোম্পানির সংগঠন বিধিকে বুঝাবে।"
- **চার্লসওয়ার্থ ও কেইনের** ভাষায়, "সংঘবিধি হলো কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার নিয়মাবলি।"

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, পরিমেল নিয়মাবলি এমন একটি দলিল যাতে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচালকবৃন্দের ক্ষমতা, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার, হিসাবপত্র সংরক্ষণসহ যাবতীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলি থাকতে পারে অথবা ১৯৯৪ কোম্পানি আইনের ১৮ ধারা অনুসারে তফসিল-১ এর প্রবিধানগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু

কোম্পানি সংগঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি। কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যাবলি ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি এ পরিমেল নিয়মাবলিতে লিপিদ্ধ থাকে। নিম্নে নিয়মাবলিতে উল্লিখিত বিধি বা নিয়মাবলি আলোচিত হলো:

১. **পরিচালনা:** কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যাবলি কীভাবে পরিচালিত হবে সেসব নিয়মাবলি।

২. **পরিচালকদের বৃত্তান্ত:**
   - ক. কোম্পানির পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় যেসব ব্যক্তিবর্গ নিযুক্ত থাকবেন তাদের নাম এবং ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকারের বর্ণনা।
   - খ. পরিচালকদের সংখ্যা, পারিশ্রমিক ও পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক গ্রহীত যোগ্যতাসূচক শেয়ারের বর্ণনা।

৩. **মূলধন বিষয়ক তথ্য:**
   - ক. অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ও তা পরিবর্তন করার নিয়মাবলি
   - খ. ন্যূনতম পুঁজির পরিমাণ

৪. **শেয়ার সংক্রান্ত বিবরণ:** শেয়ার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়াদি-
   - ক. শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ
   - খ. শেয়ারের মোট সংখ্যা
   - গ. প্রতি শেয়ারের মূল্য ও তা পরিশোধের পদ্ধতি
   - ঘ. শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি ও বাজেয়াপ্ত করার নিয়মাবলি
   - ঙ. কিস্তিতে আদায়যোগ্য শেয়ারের আবেদন, বণ্টন, তলব ইত্যাদি বিভিন্ন কিস্তিতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ
   - চ. শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম ও হস্তান্তর ফি-এর পরিমাণ
   - ছ. শেয়ার বিক্রয়ের কমিশনের হার
   - জ. শেয়ার সার্টিফিকেট বিলির পদ্ধতি
   - ঝ. শেয়ারের পূর্বস্বত্ব ও তলবের নিয়মাবলি ইত্যাদি।

৫. **কোম্পানির সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি:**
   - ক. সদস্য পরিচালক পর্ষদের সভা আহ্বান পদ্ধতি

খ. উক্ত সভা পরিচালনার পদ্ধতি
গ. সদস্যদের ভোটাধিকার ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।

৬. **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতি:** এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হলো-
ক. হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
খ. হিসাব নিরীক্ষার পদ্ধতি
গ. নিরীক্ষকদের নাম ও ঠিকানা

৭. **লভ্যাংশ:** লভ্যাংশ ঘোষণার পদ্ধতি এবং মুনাফার অংশকে মূলধনে পরিণত করার নিয়ম।

৮. **ঋণ গ্রহণ:** কোম্পানিরর ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ও ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি।

৯. **নিয়োগ:**
ক. ব্যবস্থাপক ও সচিবের নিয়োগ পদ্ধতি
খ. সলিসিটর, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি ইত্যাদি নিয়োগ পদ্ধতি।

১০. **সিলমোহর:** কোম্পানির সিলমোহর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাবলি।

১১. **বিলোপসাধন:** কোম্পানি বিলোপসাধন করতে হলে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার বিবরণ।

বিবরণপত্র ও বিষয়বস্তু এবং বিকল্প বিবৃতি

Prospectus, contents and statement in lieu

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে শেয়ার (বা ঋণপত্র) ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে প্রচারপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে বিবরণপত্র বলে। বিবরণপত্রে কোম্পানির পরিপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়াস চালানো হয়। নিম্নে বিবরণপত্রের দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৪২ ধারায়** বলা হয়েছে, "শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত দলিল বিবরণপত্র বলে গণ্য।"
- **১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ২(৩৬) ধারায়** বলা হয়েছে, "কোনো কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্রে বিনিয়োগের আবেদন সম্বলিত বা এরূপ বিনিয়োগের প্রস্তাব সম্বলিত জনগণের উদ্দেশ্যে প্রাচারিত কোনো বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন বা বিবরণ সম্বলিত কোনো দলিলই হলো বিবরণপত্র।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনসাাধরণকে শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় করার জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রচারিত যে কোনো বিজ্ঞপ্তি, প্রাচরপত্র বা বিজ্ঞাপনকে বিবরণপত্র নামে অভিহিত করা যায়।

বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু

আগেই বলা হয়েছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাই বিবরণপত্র। এই বিবরণপত্রে কোম্পানি সম্পর্কে জনসাধারণকে ধারণা দেওয়া হয়। বিবরণপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুসমুহ অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **নাম ও ঠিকানা:** কোম্পানির নাম ও নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা।

২. **উদ্দেশ্য:** কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসমূহ।

৩. **প্রবর্তক:** পরিমেলবন্ধে যে সব প্রবর্তক স্বাক্ষর করেছেন তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও যোগ্যতাসূচক শেয়ারের বিবরণ।

৪. **পরিচালকবৃন্দ:** পরিচালকমণ্ডলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপকদের নাম ঠিকানা, নিয়োগ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি এবং পরিচালকদের স্বাক্ষর।

৫. **মূলধন:** অনুমোদিত মূলধন, শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ, শেয়ারের সংখ্যা, প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ও শেয়ারের টাকা পরিশোধের পদ্ধতি এবং ন্যূনতম আদায়ী মূলধনের পরিমাণ।

৬. **ব্যাংকার ও অন্যান্য:** ব্যাংকার, হিসাব নিরীক্ষক, দালাল, আইন উপদেষ্টা প্রভৃতির নাম ঠিকানা ও পারিশ্রমিকের বিবরণ।

৭. **দায় গ্রহণ:** কেউ শেয়ার বণ্টনের দায় গ্রহণ করলে তার নাম ঠিকানা ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ।
৮. **দলিলপত্র:** কোম্পানির পরিমেলবন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৯. **শেয়ারহোল্ডার:** শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষমতা, অধিকার ও দায়দায়িত্ব এবং কোম্পানির সম্পত্তিতে তাদের স্বার্থ।
১০. **অবলেখক:** শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য অবলেখক নিযুক্ত হয়ে থাকলে তার নাম, ঠিকানা ও পারিশ্রমিক।
১১. **লভ্যাংশ:** লভ্যাংশ বণ্টনের পদ্ধতি।
১২. **প্রাথমিক খরচ:** কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক খরচের বিবরণ।
১৩. **অন্যান্য:**

ক. কোম্পানির হিসাবের বই পরিদর্শনের নিয়ম;
খ. পূর্বের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহারের নিয়মাবলি;
গ. কোম্পানি গঠনের পূর্বে বা সে সময়ে ক্রীত কোনো সম্পত্তির বিবরণ;
ঘ. পূর্ব চুক্তির (যদি থাকে) বিবরণ;
ঙ. কোম্পানির লাভ লোকসানের খতিয়ান ও দায়দায়িত্বের বিবরণ ইত্যাদি।

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি হচ্ছে বিবরণপত্রের হুবহু অনুকরণে তৈরি একটি বিবরণপত্র যা জনগণের উদ্দেশ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার না করে হলেও নিবন্ধকের নিকট জমাদানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। একে বিকল্প বিবরণপত্র বলে।

কোম্পানির প্রবর্তকগণ যদি নিজেরাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হন তাহলে তাদের আর জনসাধারণের নিকট শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করার প্রয়োজন হয় না। এমতাবস্থায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী তারা বিবরণপত্রে যে সব বিষয় উল্লিখিত থাকে তার হুবহু অনুকরণে একটি বিকল্প বিবরণপত্র তৈরি করেন। এ বিকল্প বিবরণপত্র প্রবর্তকগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। বিবরণপত্রের ন্যায় বিকল্প বিবরণপত্রের কোনো শর্ত সদস্যদের সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা যায় না (ধারা ১১৪)।

নিবন্ধনপত্র

Certificate of registration

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধান পালন করে কোনো কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাগণকে নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। নিবন্ধক কোম্পানির নিবন্ধনের প্রমাণ হিসেবে যে দলিল প্রদান করেন তাকে নিবন্ধনপত্র বলে। একে নিয়মিতকরণের প্রত্যয়নপত্রও (Incorporation) বলে। নিচে নিবন্ধনপত্রের একটি নমুনা দেওয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যৌথমূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের কার্যালয়
১, টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

নিবন্ধনপত্র

পত্র নং: ৮২৫২/৫৬/২০১৯ তারিখ: ৮ জুলাই ২০১৯

আমি সত্যায়িত করছি যে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী লুনা প্রকাশনী লিমিটেড -কে অদ্য ৮ জুলাই ২০১৯, শেয়ার দ্বারা সীমিত দায়বদ্ধ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করা হলো।

সিলমোহর

মোগল ইবনে ইসলাম
নিবন্ধক

নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই কোম্পানির আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয়। প্রাইভেট কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে কিন্তু পাবলিক লিঃ কোম্পানি তা পারে না।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র

Certificate of commencement

নিবন্ধনপত্র পাবার পর ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোম্পানির নিবন্ধক কর্তৃক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় তাকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বলে। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৫০ ধারা মোতাবেক পাবলিক লিমিটেড কোম্পনির কার্য শুরু করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পালিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হয়:

১. কোম্পানি বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবরণপত্রের এক কপি দাখিল করা হয়েছে।
২. ন্যূনতম পুঁজি সংগৃহীত হয়েছে।
৩. পরিচালকগণ যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করেছেন।
৪. প্রয়োজনীয় সব কাজ যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে এ মর্মে একজন কোম্পানি পরিচালক বা সচিবের ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

এসব শর্তাবলি পূরণ করার পর নিবন্ধক কোম্পানিকে ব্যবসায় শুরু করার জন্য যে ছাড়পত্র প্রদান করেন এটিই কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র।

পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার

Director`s qualifying shares

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালক হতে হলে নির্দিষ্ট সংখ্যাক শেয়ার ক্রয় করতে হয়। কোম্পানি আইনের একজন পরিচালক কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে ক্রীত এ শেয়ারকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

কোম্পানির উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে কোম্পনির প্রথম পরিচালক হিসেবে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাদেরকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করতে হয়। কোম্পানি আইনে এ যোগ্যতাসূচক শেয়ারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাগণই এ শেয়ারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেন। একজন পরিচালক কতগুলো যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করবেন তা কোম্পানির স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লেখ থাকে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কোম্পানির পরিচালক হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোম্পানির প্রবর্তকগণ (বা উদ্যোক্তা) কর্তৃক নির্ধারিত এবং স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলিতে বর্ণিত যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হয় তাকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি গঠন করার ক্ষেত্রে কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বাংলাদেশের কোম্পানি সংগঠনসমূহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাদেরকেই কোম্পানির উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলে। কোম্পানির নাম, অবস্থান, উদ্দেশ্য, সদস্যদের পুঁজির পরিমাণ, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদির বিবরণসহ কোম্পানির ক্ষমতার সীমা নির্দেশক দলিলকে স্মারকলিপি বলে। কোম্পানির যে দলিলে এর অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি বা বিধি-উপবিধি লিপিবিদ্ধ থাকে তাকে পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘবিধি বলা হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে শেয়ার (বা ঋণপত্র) ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে প্রচারপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে বিবরণপত্র বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালক হতে হলে নির্দিষ্ট সংখ্যাক শেয়ার ক্রয় করতে হয়। কোম্পানি আইনের একজন পরিচালক কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে ক্রীত এ শেয়ারকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

পাঠ ৬.৬ কোম্পানির মূলধনঃ শেয়ার ও ঋণপত্র
Capital of Company: Share and Debenture

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলো বলতে পারবেন।
- শেয়ার ও শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্ট কী বলতে পারবেন।
- স্টক কী বলতে পারবেন।
- ঋণপত্র কী ও ঋনপত্রের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

কোম্পানির মূলধন বলতে সাধারণ অর্থে কোম্পানির যাবতীয় স্থায়ী ও চলতি সম্পদের সমষ্টিকে বোঝানো হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবসায়ের সর্ব প্রকার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে তহবিল গঠন করে তাকে কোম্পানির মূলধন (বা পুঁজি) বলা হয়। প্রধানত দুটি কারণে মূলধনের প্রয়োজন হয়। প্রথমত কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং দ্বিতীয়ত কোম্পানির দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা স্থায়ী মূলধন নাম পরিচিত। পক্ষান্তরে, কোম্পানির দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি চালানোর জন্য ব্যয়িত অর্থকে বলা হয় চলতি মূলধন। আসুন জেনে নেই কোম্পানির মূলধন সম্পর্কিত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে।

কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উৎসসমূহ
Ways of obtaining company's capital

একটি কোম্পানি অনেক উৎস থেকে মূলধন বা পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। তবে সব উৎস থেকে সব সময় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব না ও হতে পারে। আবার সব উৎস সমান লাভজনকও নয়। কিছু কিছু উৎসের সাথে তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকি বিদ্যমান। কোনো কোনো উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের ব্যয়ও বেশি। এসব কারণে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আসুন জেনে নিই, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ উৎসগুলো কী:

১. শেয়ার বিক্রয়
২. ঋণপত্র বিক্রয়
৩. অবণ্টিত মুনাফা ব্যবহার
৪. জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ
৫. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি প্রদত্ত ঋণ
৬. বিশেষায়িত সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণ
৭. সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ
৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
৯. আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থানসমূহ থেকে প্রাপ্ত ঋণ
১০. জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ

কোম্পানি বা তার উদ্যোক্তাগণ সাধারণত মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে এসব উৎসকেই প্রধান্য দিয়ে থাকেন। এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংগ্রহের ভিত্তিতে কোম্পানির মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়- শেয়ার মূলধন ও ঋণ মূলধন। আসুন এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিই।

শেয়ার কী এবং শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ

What is share and classification of share

কোম্পানি অনুমোদিত মূলধনকে সমান অংশবিশিষ্ট কতকগুলো ক্ষদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা হয়। মূলধনের প্রতিটি ক্ষুদ্র এককে একেকটি শেয়ার বলে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান সমান হয় এবং এর একটি নির্দিষ্ট আংকিক মূল্য (face value) থাকে। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমেই এর ক্রেতাগণ (shareholder) কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। শেয়ার এর দুটি সার্বজনীন সংজ্ঞা:

১. **বিচারপতি জে. ফারওয়েল (J. Farwell)** এর ভাষ্য অনুযায়ী, "শেয়ার বলতে টাকার অংককে বোঝায় না, এরদ্বারা টাকার পরিমাপযোগ্য একটি স্বার্থকে বোঝায় যা চুক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার অধিকারের সৃষ্টি করতে পারে।" [A share is not a sum of money, but an interest measured in a sum of money and made up of various rights contained in the contract.][8]

২. **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১)(ধ) ধারায়** বলা হয়েছে, শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোনো অংশকে বোঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক বা শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সেই স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টকও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ওপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কোম্পানি সংগঠনের মোট মূলধনকে কতগুলো সমান মূল্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হলে এর প্রতিটি অংশই এক একটি শেয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়।

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ

শেয়ার হচ্ছে কোম্পানি সংগঠনের মোট মূলধনের ক্ষুদ্রতম একক। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে কোম্পানি বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার ইস্যু করে থাকে। রেখা চিত্রে প্রদর্শনপূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির শেয়ার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

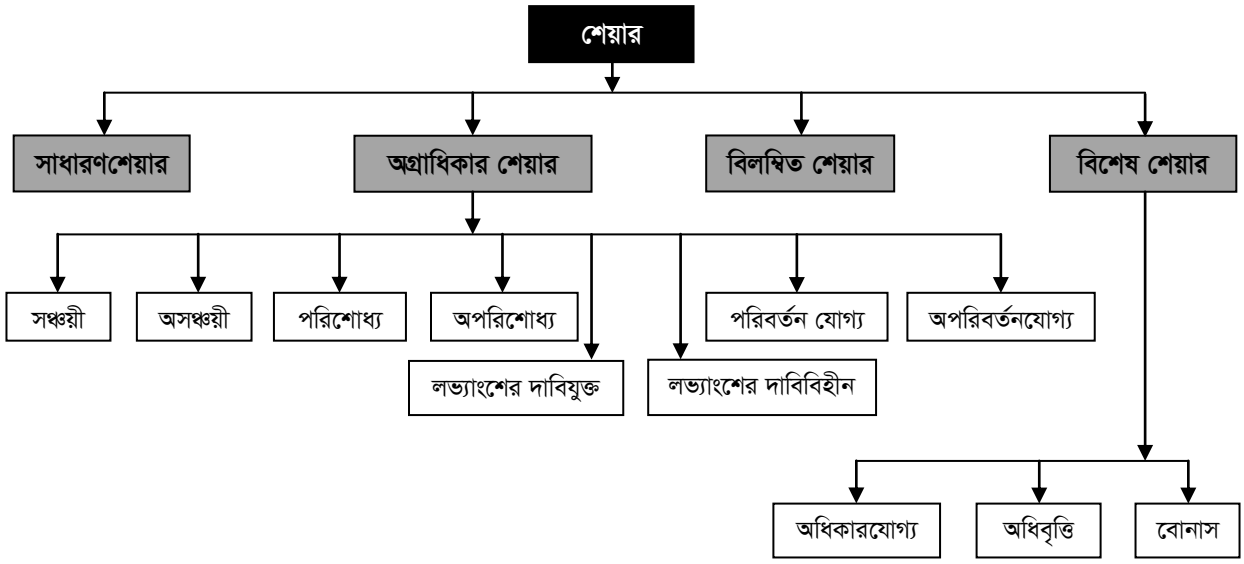

চিত্র ৬.২: বিভিন্ন প্রকার শেয়ার।

[8] Borland's Trustee v Steel Brothers & Co Ltd [1901] 1 Ch 279

১. **সাধারণ শেয়ার বা ইক্যুইটি শেয়ার (Ordinary or equity share):** যে শেয়ারের মালিকের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব কোম্পানিতে সর্বাধিক কিন্তু লভ্যাংশ পাবার ক্ষেত্রে ও মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় না তাকে সাধারণ শেয়ার বলে। এ শেয়ারের মালিকেরা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ বণ্টিত হবার পর শতকরা হারে লভ্যাংশ পায় এবং কোম্পানির বিলুপ্তিকালে সবার শেষে মূলধন ফেরত পায়।

২. **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference share):** কোম্পানি যে শেয়ারের ওপর নির্দিষ্ট হারে অন্যান্য শেয়ারের আগে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের বিলুপ্তিকালে মূল্য ফেরত দেওয়া হয় তাকে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলে। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারকে নিম্নোক্ত আট শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

ক. সঞ্চয়ী বা নিরবচ্ছিন্ন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার(Cumulative preference share): এ ধরনের অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের ওপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ সঞ্চিতি হিসাবে জমা হতে থাকে। কোম্পানির লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন যখনই মুনাফা হবে তখনই শেয়ারহোল্ডাররা বর্তমানের এবং পূর্বের যাবতীয় পাওনা লভ্যাংশ আদায় করতে পারে।

খ. সঞ্চয়ী বা অনিরবচ্ছিন্ন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Non-cumulative preference share): এরূপ শেয়ারের উপর শুধুমাত্র যে বছর মুনাফা অর্জিত হয় সে বছরই লভ্যাংশ দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ধরনের শেয়ারের মালিকগণ নিরবচ্ছিন্ন লভ্যাংশ ভোগের অধিকারী নয়।

গ. পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable preference share): এরুপ শেয়ার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিলি করা হয় এবং মেয়াদ শেষে কোম্পানি এগুলোর মূল্য পরিশোধ করে দিতে পারে।

ঘ. অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Unredeemable preference share): এ ধরনের শেয়ারের মূল্য কোম্পানির বিলোপসাধন পর্যন্ত ফেরত দেওয়া যায় না। শেয়ার মালিকেরা কোম্পানির জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট হারে মুনাফা ভোগ করতে থাকে।

ঙ. লভ্যাংশের দাবিযুক্ত বা অংশগ্রহণমূলক অগ্রাধিকার শেয়ার (Participating share): নির্দিষ্ট লভ্যাংশ ছাড়াও যে শেয়ারের ওপর অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয় তাকে লভ্যাংশের দাবিযুক্ত বা অংশগ্রহণমূলক অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

চ. লভ্যাংশের দাবিবিহীন বা অংশগ্রহণবর্জিত অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Participating share): এ জাতীয় শেয়ারের ওপর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অন্যান্য শেয়ারের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয় না।

ছ. পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Convertible preference share): মেয়াদ সমাপনান্তে বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী যে অগ্রাধিকার শেযারকে সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তন করা যায় তাকে পরিবর্তনযোগ্য শেয়ার বলে।

জ. অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Convertible preference share): এ ধরনের শেয়ারকে কখনই পরিবর্তন করে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না।

৩. **বিলম্বিত বা প্রবর্তকদের শেয়ার (Deferred share):** অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ দেওয়ার পর কোম্পানির মুনাফা বাকি থাকলে সেখান থেকে যে শেয়ারে ওপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাকে প্রবর্তক শেয়ার বা বিলম্বিত শেয়ার বা উদ্যোক্তার শেয়ার বলে।

৪. **বিশেষ শেয়ার (Special share):** উপরিউক্ত কয়েক প্রকারের শেয়ার ছাড়াও আরও কিছু শেয়ার রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. অধিকারযোগ্য শেয়ার (Right share): কোনো কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে যদি এরূপ বিধান থাকে যে, ভবিষ্যতে কোম্পানি যে সব নতুন শেয়ার বিলি করবে তা বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের ক্রয়ের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এরূপ শেয়ারকে অধিকারযোগ্য শেয়ার নামে পরিচিত।

খ. অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার (Bonus share): কোম্পানি অনেক সময় অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ বা পুরোটাই লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ না করে তা কোম্পানির মূলধনে রূপান্তরিত করে নেয় এবং পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের নামে লভ্যাংশের পরিবর্তে এ শেয়ার ইস্যু করে। এ জাতীয় শেয়ারকে অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বলা হয়।

গ. অনির্ধারিত বা অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (Non-par value share): যে শেয়ারের কোনো মূল্য নির্ধারিত থাকে না তাকে অনির্ধারিত বা অনাঙ্কিক শেয়ার বলে। এ শেয়ার সাধারণত বছর শেষে হিসাব নিকাশের পর মোট সম্পদ থেকে অন্যান্য আয়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারিত হয়।

শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্ট

Share certificate and share warrant

কোম্পানির শেয়ার বণ্টনের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে শেয়ার মালিকানার প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের নামে যে সনদ বা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয় তাকে শেয়ার সার্টিফিকেট বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৩১ ধরায় শেয়ার সার্টিফিকেট সম্পর্কে বলা হয়েছে, "কোনো সদস্যের শেয়ার বা স্টক কোম্পানির সাধারণ সিলমোহরযুক্ত সার্টিফিকেটে বর্ণিত থাকলে, প্রাথমিকভাবে উক্ত সার্টিফিকেটই এতে বর্ণিত শেয়ার বা স্টকের মালিকানার সাক্ষ্য বহন করবে"।

সুতরাং শেয়ার সার্টিফিকেট শেয়ার মালিকানার নিবন্ধিত প্রমাণপত্র। এটি যথোপযুক্ত স্ট্যাম্পযুক্ত হয়। এতে কোম্পানির সীলমোহর থাকে এবং এক বা একাধিক পরিচালকের স্বাক্ষর ছাড়াও সচিবের প্রতিস্বাক্ষর থাকে। শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ারহোল্ডারের নাম, ঠিকানা, পেশা, শেয়ারের ক্রমিক নম্বর, শেয়ারের সংখ্যা, শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য (face value) উল্লেখ থাকে।

শেয়ার ওয়ারেন্ট

শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পর পূর্ণ আদায়ী শেয়ারের মালিক হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেযারহোল্ডারকে যে দলিল প্রদান করে তাকে শেয়ার ওয়ারেন্ট বলা হয়। শেয়ার ওয়ারেন্ট শেয়ারের মালিকানা স্বত্বের দলিল স্বরূপ। আংশিক পরিশোধিত শেয়ারের জন্য শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয় না। এটা হস্তান্তর করা যায় না। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র পরিমেল নিয়মাবলিতে এ মর্মে বিধান থাকলেই শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করা যায়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করতে পারে না।

স্টক কী

What is stock

কোম্পানির মূলধন অনেকগুরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি আংকিক মূল্য থাকে। অর্থাৎ কোম্পানির মূলধন বহুবিধ সমমূল্যের ভগ্নাংশের সমষ্টি। একেকটি ভগ্নাংশ একেকটি শেয়ার দ্বারা চিহ্নিত। এই শেয়ারগুলো যখন সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয় তখন এগুলোকে অসম মূল্যবিশিষ্ট অংশরূপে প্রকাশ করা যায়। সবগুলো পূর্ণ আদায়ী শেয়ারের এই রূপকে স্টক বলা হয়।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে স্টকের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে উক্ত আইনের **২(১-ধ) ধারায়** বলা হয়েছে, "ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেলে সে স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টক শেয়ারের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ২(৪৬) ধারায় বর্ণিত আছে যে, "Share includes stock". এ আইনের **৯৪(১-গ)** ধারায় বলা হয়েছে, "শেয়ারকে স্টকে পরিণত করা যায়। তবে কেবলমাত্র পূর্ণমূল্য আদায়কৃত শেয়ারসমূহই স্টকে পরিণত করা যায়"।

স্টককে বিভিন্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। স্টকের সবগুলো ভগ্নাংশের মূল্য একইরূপ হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন মূল্যেরও হতে পারে। যেমন- ৫ টাকার স্টক, ৫০ টাকার স্টক ইত্যাদি। অর্থাৎ স্টক বিভাজ্য। স্টককে ভগ্নাংশে ক্রয়বিক্রয় করা যায়, যা শেয়ারের বেলায় সম্ভব নয়। পরিমেল নিয়মাবলির বিধান অনুযায়ী যে কোনো লিমিটেড কোম্পানি তার পূর্ণ-আদায়ী শেয়ারকে স্টকে শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে। তবে শেয়ারকে স্টকে রূপান্তরিত করার পূর্বে সাধারণ সভার অনুমোদন প্রয়োজন।

কোম্পানি ইচ্ছে করলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে স্টককে আবার শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে। স্টককে শেয়ারে পরিবর্তিন করা হলে তা নিবন্ধককে জানানো আবশ্যক। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলেও বিশ্বের কয়েকটি দেশে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। সেখানে সাধারণ শেয়ারকে স্টক হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম।

ঋণপত্র ও ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ

Debenture and classification of debenture

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহের জন্য যে দলিল প্রদান করে তাকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বলা হয়। অর্থাৎ অন্যের নিকট থেকে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকৃতিপত্রই ঋণপত্র নামে পরিচিত। এ ঋণপত্র এমন একটি প্রামাণ্য দলিল যার মাধ্যমে ঋণের টাকা সুদসহ ফেরতদানের অঙ্গীকার করা হয়।

- ঋণপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **পার্মার** বলেন, "যে দলিল কোনো কিছু বিক্রয়ের চুক্তিপত্র হিসেবে কাজ করে সেই দলিলকে ঋণপত্র বলে।"
- বাংলাদেশে **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঙ) ধারায়** বলা হয়েছে, "ডিবেঞ্চার বলতে কোম্পানির পরিসম্পদের ওপর কোনো চার্জ সৃষ্টি করুক বা না করুক কোম্পানির ডিবেঞ্চার, স্টক, বন্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটিও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মূলধন যখন অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় কোম্পানি তখন ঋণপত্র ইস্যু করে এবং সংগৃহীত টাকা দিয়ে মূলধনের অভাব পূরণ করে। ঋণপত্র বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ কোম্পানির ঋণ। এ ঋণের ওপর প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয় এবং কোম্পানির বিলোপের সময় শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়ার আগে ঋণপত্রের টাকা ফেরত দিতে হয়।

ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ

ঋণপত্র হলো কোম্পানি কর্তৃক ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি দলিল। ঋণপত্র নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে:

১. **সাধারণ ঋণপত্র (Ordinary debenture):** এ ধরনের ঋণপত্রে শুধু সুদ ও ঋণের আসল টাকা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার থাকে। কোম্পানির কোনো সম্পদের জামানত দেওয়া হয় না। জামানতবিহীন ঋণ বিধায় সাধারণ ঋণপত্রকে জামানত বর্জিত বা অবাধ ঋণপত্রও বলা হয়।

২. **জামানতি বা বন্ধকি ঋণপত্র (Secured or mortgage debenture):** কোম্পানির স্থায়ী বা অন্য যে কোনো প্রকার সম্পদের জামানতে যে ঋণপত্র ইস্যু করা হয় তাকে জামানতী বা বন্ধকি ঋণপত্র বলা হয়। এরূপ ঋণপত্রের বেলায় প্রদত্ত জামানতে কোনো একটা নির্দিষ্ট সম্পদও হতে পারে, আবার নির্দিষ্ট না হয়ে অন্য যেকোনো সম্পদও হতে পারে।

৩. **পরিশোধ্য ঋণপত্র (Redeemable debenture):** এ ধরনের ঋণপত্রের বেলায় কোম্পানি একটা নির্দিষ্ট সময় পর ঋণপত্রের আসল টাকা পরিশোধ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখে। অর্থাৎ কোম্পানি ইচ্ছা করলে মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যেকোনো সময় ঋণপত্রের আসল অর্থ ফেরত দিতে পারে।

৪. **অপরিশোধ্য ঋণপত্র (Irredeemable debenture):** সুদের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হবে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কোম্পানির অস্তিত্ব থাকে ততোদিন পর্যন্ত আসল টাকা শোধ করা হবে না- এ শর্তে যে ঋণপত্র ইস্যু করা হয় তাই অপরিশোধ্য ঋণপত্র।

৫. **নিবন্ধিত ঋণপত্র (Registered debenture):** এরূপ ঋণপত্রের বেলায় কোম্পানির নিবন্ধন বইতে ঋণপত্র গ্রহীতার নাম-ঠিকানা, ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ থাকে এবং এগুলো হস্তান্তর করা হলে নিয়মমাফিক হস্তান্তর দলিল প্রস্তুত করতে হয়।

৬. **অনিবন্ধিত ঋণপত্র (Unregistered debenture):** যে ঋণপত্র মালিকদের নাম-ঠিকানা, ক্রমিক সংখ্যা কোম্পানির নিবন্ধন বইতে সংরক্ষিত থাকে না তাকে অনিবন্ধিত ঋণপত্র বলে। এরূপ ঋণপত্র হস্তান্তরের সময় কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় না।

৭. **পরিবর্তনযোগ্য বা রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (Convertible debenture):** যে ঋণপত্র বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী শেয়ার মালিকগণ একট নির্দিষ্ট সময় পর যাদের ঋণপত্রকে শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে তাই পরিবর্তনযোগ্য বা রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র।

৮. **অপরিবর্তনীয় বা অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (Unconvertible debenture):** যে ঋণপত্র ফেরত নিয়ে কোম্পানি কখনই শেয়ারে রূপান্তর করে না তাকে অপরিবর্তনীয় বা অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বলা হয়।

উপরিউক্ত কয়েক প্রকারের ঋণপত্র ছাড়াও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বাহক ঋণপত্র নামে আরও এক প্রকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়ে। এরূপ ঋণপত্রে ক্রেতাদের নাম কোম্পানির খাতায় উঠানো হয় না এবং হস্তান্তরের সময় হস্তান্তর দলিলও প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না।

সারসংক্ষেপ

পণ্য বিণিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্য প্রক্রিয়াই হচ্ছে বাণিজ্য। সর্ব প্রকার পণ্যসামগ্রী জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিই হলো বাণিজ্য। উৎপাদক ও ভোক্তা যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য কতিপয় আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। এরূপ কার্যাবলির সবগুলোই বাণিজ্যের আওতাভুক্ত। পণ্যদ্রব্য উৎপাদকের নিকট থেকে ভোক্তার নিকট প্রেরণকালে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতার বা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এ সব প্রতিবন্ধকতাসমূহ ব্যক্তি, স্থান, সময়, ঝুঁকি, অর্থ ও প্রচার সম্পর্কিত। বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিবন্ধাকতা দূর করার জন্য ট্রেড, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিমা, ব্যাংক ও বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়া হয়। এগুলোকে বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখা বা

পাঠ ৬.৭ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী
Directors of Company

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা পরিচালক পর্ষদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিচালকমণ্ডলীর নিয়োগ কীভাবে হয় বলতে পারবেন।
- পরিচালকদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিচালকদের অধিকার, ক্ষমতা ও দায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিচালকদের অবসরগ্রহণ ও অপসারণ কীভাবে হয় বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোম্পানি পরিচালনা করেন মূলত পরিচালকরা। পরিচালকদেরকেই সম্মিলিতভাবে বলা হয় পরিচালকমণ্ডলী। পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানি আইন ও পরিমেলবন্ধ বা পরিমেল নিয়মাবলির বিধান মোতাবেক কোম্পানি পরিচালনা করেন। যেকোনো ব্যক্তি কোম্পানির পরিচালক হতে পারেনা। নিয়ম অনুযায়ী পরিচালক নিয়োগ করতে হয়। এমনকি তাদের অপসারণ ও অবসরগ্রহণের ব্যাপারেও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অত্র পাঠে আমরা পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবো।

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা পরিচালক পর্ষদ
Board of directors of a company

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তাদের প্রত্যেককে পরিচালক এবং সম্মিলিতভাবে পরিচালকমণ্ডলী বলা হয়। পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব তাদের ওপরই অর্পণ করা হয়। পরিচালকমণ্ডলী ব্যবসায় সংক্রান্ত পলিসি প্রণয়ন করেন এবং এসব পলিসি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। নিম্নে পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঝ) ধারায়** কোম্পানির পরিচালক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পরিচালক বলতে পরিচালক পদে আসীন যে কোনো ব্যক্তি, তিনি যে নামেই অভিহিত হন না কেন, অন্তর্ভুক্ত হবেন"। [Director includes any person ocdupying the position of a director by whatever name called.]
- **দত্ত ও সিকদার** (Datta and Sikder) এর মতে, "একটি ক্ষুদ্র সদস্যগোষ্ঠী যারা কোম্পানির পরিচালনা ও পলিসি নির্ধারণ করেন এবং সাধারণ সদস্যদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করেন তাদেরকে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বলে"। [The small group of members who direct and control the policy of a company and manage the business of the company on behalf and as representatives of the general body of members may be called the directors of the company.]

পরিচালকমণ্ডলী তাদের কাজের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের নিকট দায়ী থাকেন। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন পরিচালক থাকা আবশ্যক (ধারা ৯০)।

পরিচালকমণ্ডলীর নিয়োগ

Appointment of directors

পরিচালকমণ্ডলী একটি কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সুতরাং তাদের নিয়োগের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইন এর ৯১ ও ১২৫ ধারায় পরিচালকদের নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সে মতে নিম্নোক্ত উপায় এ পরিচালকমণ্ডলীর নিয়োগ হয়ে থাকে:

১. **প্রবর্তকগণ কর্তৃক (By promoters):** কোম্পানির প্রবর্তকগণ কোম্পানির প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত পরিচালক নিযুক্ত করা না হয় ততোদিন পর্যন্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরদানকারী প্রবর্তকগণ পরিচালক হিসেবে স্বনিয়োজিত হতে পারেন। এদের কার্যকালের মেয়াদ কোম্পানির প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত বহাল তাকে।

২. **শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক (By shareholders):** পরিমেল নিয়মাবলির বিধান অনুসারে প্রতি বছর শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভায় পরিচালক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এরূপ নির্বাচনের দ্বারা অবসর প্রাপ্ত পরিচালকদের শূন্যপদ পুরণ করা হয়।

৩. **পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক (By directors):** কোম্পানিতে কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো পরিচালকের পদ শূণ্য হলে, পরিচালকমণ্ডলী মনোনয়নের মাধ্যমে উক্ত পদে পরিচালক নিযুক্ত করতে পারেন। উক্ত ব্যক্তি শূন্য পদে পূর্বে নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত পরিচালক পদে বহাল থাকবেন।

৪. **ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক (By managing agent):** পরিমেল নিয়মাবলিতে বিধান থাকলে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি মোট পরিচালক সংখ্যক সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ পরিচালক নিযুক্ত করতে পারেন।

৫. **সরকার কর্তৃক (By the Government):** বিধিবদ্ধ ও রাষ্ট্রয়াত্ত্ব কোম্পানিতে সরকার পরিচালক নিয়োগ দিতে পারেন। তবে এ বিষয়ে পরিমেল নিয়মাবলিতে বিধান থাকতে হয় এবং শেয়ারহোল্ডারগণ সরকারের কাছে আবেদন করলে সরকার এ ধরনের নিয়োগ দিতে পারেন।

পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যাবলি

Responsibilities, duties and functions of directors

কোম্পানি আইন, পরিমেল নিয়মাবলির বিধান এবং বিভিন্ন মোকদ্দমার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালকদের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সততার সাথে কাজ করা।
২. ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা।
৩. পরিচালক পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভায় নিয়মিত যোগদান করা।
৪. কর্মচারীরা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করছে কি না তা তদারক করা।
৫. ন্যূনতম চাঁদা সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বণ্টন না করা।
৬. বণ্টনের এক মাসের মধ্যে শেয়ার বণ্টনের বিবরণী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা।
৭. নিবন্ধিত কার্যালয়ে সদস্যদের তালিকা সংরক্ষিত রাখা।
৮. নিবন্ধকের নিকট বার্ষিক বিবরণী পেশ করা।
৯. বন্ধক ও দায়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করে তা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করা।
১০. কোম্পানির নাম প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে খোদাই করা বা টাঙ্গানো হয়েছে কিনা তার প্রতি লক্ষ রাখা।
১১. নিয়ম মাফিক সাধারণ সভা আহবান করা।
১২. কার্যারম্ভের ছয় মাসের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করা।
১৩. প্রস্তাবিত কোনো চুক্তিতে কোনো পরিচালকের স্বার্থ থাকলে তা পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা।
১৪. নিজ নাম-ঠিকানা, পেশা ও আনুষঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করা।
১৫. কয়টি শেয়ার তিনি ক্রয় করেছেন তা প্রকাশ করা।
১৬. পরিমেলবন্ধে পরিবর্তন সাধন করা হলে পরিবর্তিত পরিমেলবন্ধ প্রকাশ করা।
১৭. বিশেষ সিদ্ধান্ত ও অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা।

১৮. বিবরণপত্র প্রচারের পূর্বে এর একটি অনুলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা।
১৯. ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষা করা।
২০. স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেট ও স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রচার করা।

পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলি

কোম্পানি সংগঠনের পরিচালকদের কার্যাবলি কোম্পানি আইনের পরিমেল নিয়মাবলি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রম পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হচ্ছে কিনা পরিচালকমণ্ডলী তা দেখাশুনা করেন। সাধারণত কোম্পানির পরিচালকগণ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন:

চিত্র ৬.৩: পরিচালকমন্ডলীর কার্যাবলি

নিম্নে এগুলো আলোচিত হলো:

১. **পলিসি নির্ধারণ করা (Determining policy):** যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের পরিচলকগণ কোম্পানির প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ, তার তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করে থাকেন।

২. **নিয়ন্ত্রণ করা (Controlling):** কোম্পানির যাবতীয় কার্যাদি আইন ও নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তার নিয়ন্ত্রণ করাও পরিচালকমন্ডলীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৩. **কোম্পানির স্বার্থরক্ষা (Maintaining interest of the company):** পরিচালকমন্ডলী শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থের অনুকূলে পরিমেল নিয়মাবলির শর্তাধীনে থেকে কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

৪. **ব্যবস্থাপকীয় দায়িত্ব পালন (Performing managerial responsibilities):** পরিমেল নিয়মাবলিতে বলা থাকলে পরিচালকগণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৫. **শূন্যপদ পূরণ (Filling up vacancy):** তারা পরিচালকের শূন্য পদে পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন।

৬. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making):** পরিচালকগণ কোম্পানির শ্রমিক নিয়োগ, বদলি, অপসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।

৭. **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (Implementing decision):** তারা কোম্পানির লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

৮. **নিয়োগ প্রদান (Appointing):** কোম্পানির জন্য দক্ষ কর্মচারী, ব্যবস্থাপক পরিচালক, সাধারণ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করার কাজটি পরিচালকগণই করে থাকেন।

৯. **বাজেট ও লভ্যাংশ অনুমোদন (Approving budget and dividend):** পরিচালকগণ নির্বাহীদের প্রণীত বাজেট ও কর্মসূচি অনুমোদন করেন এবং লভ্যাংশ ঘোষণা ও তা বণ্টন করে থাকেন।

১০. **তত্ত্বাবধান করা (Supervising):** পরিচালকগণ কোম্পানির যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি এবং হিসাব কার্যের তত্ত্বাবধান করেন।

১১. **চুক্তি সম্পাদন (Making contract):** কোম্পানির পক্ষে এরা তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন।

১২. **সমর্পিত শেয়ার গ্রহণ(Receiving surrendered shares):** কোনো শেয়ারহোল্ডার তার শেয়ারগুলো সমর্পন করতে চাইলে পরিচালকগণ তা গ্রহণ করেন।

১৩. **শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা করা (Maintaining interest of shareholders):** পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের অনুকূলে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেন।

১৪. **শেয়ারের মূল্য তলব করা (Calling shares):** তারা শেয়ার মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ারের মূল্য তলব করে থাকেন।

১৫. **হিসাবপত্র সংরক্ষণ (Maintaining accounts):** হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করা কোম্পানির পরিচালকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ন কাজ।

পরিচালকদের অধিকার, ক্ষমতা ও দায়

Rights, powers and liabilities of directors

কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন। অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

১. **অফিস গ্রহণ (Taking an office):** পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির পর প্রত্যেক পরিচালকের তার পদ ও অফিস গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

২. **পারিশ্রমিক গ্রহণ (Receiving remuneration):** প্রত্যেক পরিচালকের পারিশ্রমিক গ্রহণ কার অধিকার আছে।

৩. **নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন (Formulatin and implementing policy):** কোম্পানির নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরিচালকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করার অধিকার আছে।

৪. **পরিচালনায় অংশগ্রহণ (Participating in administrations):** কোম্পানির পরিচালনায় পরিচালকদের অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

৫. **নির্বাচনে অংশগ্রহণ (Participating in election):** অবসর প্রাপ্ত পরিচালকের পুনরায় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার অধিকার আছে।

৬. **সভাসমূহে উপস্থিত থাকা (Attending the meetings):** পরিচালক পরিষদের সভায় প্রত্যেকের উপস্থিত হবার ও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে।

৭. **অবহিত হওয়া (Getting informed):** প্রত্যেক পরিচালকের কোম্পানির যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
৮. **চুক্তিবদ্ধ হওয়া (Making contract):** পরিচালক পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকরা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখেন।
৯. **লভ্যাংশ ঘোষণা ও বণ্টন (Declaring and distributing dividend):** পরিচালকরা কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা ও বণ্টনের অধিকার রাখেন।
১০. **নিয়োগ ও অপসারণ (Appointing and terminating):** কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ করার অধিকার পরিচালকদের রয়েছে।
১১. **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ (Voluntary retirement):** নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যে কোনো পরিচালক ইচ্ছা করলে অবসর গ্রহণ করতে অথবা পদত্যাগ করতে পারেন।
১২. **ভোটাধিকার (Voting right):** প্রত্যেক পরিচালকের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ভোটদানের অধিকার রয়েছে।

পরিচালকদের ক্ষমতা

পরিচালকদের ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণত পরিমেল নিয়মাবলিতে বিশেষ ধারার উল্লেখ থাকে। পরিমেল নিয়মাবলিতে পরিচালকদের ক্ষমতার যে সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থেকেই পরিচালকগণকে কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। পরিচালক প্রাপ্ত ক্ষমতাকে দুভাগে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

ক. পর্ষদ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে প্রাপ্ত ক্ষমতা:

১. শেয়ারহোল্ডারদের নিকট শেয়ার বাবদ অর্থ তলব করা।
২. ঋণপত্র বিক্রয় করা
৩. বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা
৪. কোম্পানির তহবিল বিনিয়োগ করা

খ. শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাপ্ত ক্ষমতা:

১. ব্যবসায়ের অংশবিশেষ বা পুরো অংশ বিক্রয় করা, হস্তান্তর করা বা ইজারা প্রদান
২. আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ ঋণ করা
৩. ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অতিরিক্ত পরিচালক নিয়োগ
৫. শেয়ার ইস্যু ও বণ্টন
৬. লভ্যাংশের হার অনুমোদন
৭. অবণ্টিত মুনাফা সংরক্ষণ
৮. হিসাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ
৯. কোম্পানির পক্ষে চুক্তি সম্পাদন

পরিচালকমণ্ডলীর দায়

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে কোম্পানির আইন, স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লিখিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু যদি তারা এ সীমার বাহিরে কোনো কাজে জড়িত হয়ে পড়েন তবে প্রত্যেক পরিচালককে ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে দায়বদ্ধ হতে হয়। পরিচালকমণ্ডলীর এ দায়দায়িত্বগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. পরিচালকগণ সততার সাথে কর্তব্য পালন না করলে বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।
২. কোম্পানির আওতা বহির্ভূত কোনো কাজে কোম্পানির অর্থ ব্যবহার করলে পরিচালকগণ উক্ত অর্থ কোম্পানিকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।
৩. পরিচালকদের প্রতারণামূলক কাজের দ্বারা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিচালকগণ তা পূরণে বাধ্য থাকবেন।
৪. নিজ পদের বদৌলতে কোনো পরিচালক মুনাফা অর্জন করে থাকলে তিনি তা কোম্পানিকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৫. পরিচালকগণ কোনো প্রকার ঘুষ গ্রহণ বা গোপন মুনাফা অর্জন করতে পারবেন না।
৬. কোম্পানির তহবিল তছরুপ, অনিয়মিতভাবে শেয়ার বণ্টন, অগ্রিম তলবি অর্থ গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ইত্যাদি ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য পরিচালকগণ দায়ী থাকবেন।
৭. কোম্পানি আইনের বিধান পালন না করা হলে পরিচালকগণ তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন।
৮. কোম্পানির পক্ষে পরিচালকদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির জন্য পরিচালকগণ দায়ী থাকবেন।
৯. প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত পরিচালক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকেন।
১০. পরিচালকদের বিধিবদ্ধ জরিমানামূলক দায়ও বহন করতে হয়।
১১. কোনো পরিচালক দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত হলে তিনি ফৌজদারি দায়ে দায়বদ্ধ বলে গণ্য হবেন।

পরিচালকদের অবসরগ্রহণ ও অপসারণ

Retirement and removal of directors

পরিচালকদের ১/৩ ভাগ প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য। অবশ্য যদি পরিমেল নিয়মাবলিতে এরূপ বিধান থাকে যে, প্রতি বছর সব পরিচালক অবসর গ্রহণ করতে হবে, তাহলে সবার জন্য অবসর গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। যে সভায় পরিচালকগণকে নিয়োগ করা হয়েছিল তার পরবর্তী প্রত্যেক সাধারণ সভায় পরিচালকগণ চক্রাকারে অবসর গ্রহণ করবেন। এই পরিচালকগণের মধ্যে যারা বেশি সময় পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারাই আগে অবসর গ্রহণ করবেন। যারা একই দিনে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে কে আগে অবসর গ্রহণ করবেন তা নিজেদের মধ্যে চুক্তি অথবা লটারি দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরিচালকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করতে হয়:

১. মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে
২. দেউলিয়া হয়ে গেলে
৩. পরিচালক পর্ষদের সভায় একাধিক্রমে তিনমাস অথবা পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে
৪. নৈতিক অপরাধে ছয় মাসের অধিক সাজাপ্রাপ্ত হলে
৫. আদালত কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত হলে
৬. তলবি অর্থ প্রদানের ছয় মাসের অধিক বিলম্ব হলে
৭. সাধারণ সভায় কোম্পানির অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের (যেখানে তিনি অংশীদার বা পরিচালক) লাভজনক পদ গ্রহণ করলে।
৮. পরিচালক পর্ষদের সম্মতি ব্যতীত কোম্পানির সাথে কোনো পণ্য (বা সেবা) ক্রয়বিক্রয় বা সরবরাহ করার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হলে।
৯. কোনো পরিচালক ব্যবসায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে।

পরিচালকদের অপসারণ

আইন ও পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালকগণ একটি নির্ধারিত সময় সীমা পর্যন্ত নিযুক্ত হন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই তারা পদ থেকে অপসারিত হন। এ অপসারণ পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অপসারণ (Removal by shareholders):** কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর ১৬০(১) ধারা মতে শেয়ারহোল্ডারগণ বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে যে কোনো পরিচালককে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন।
২. **বাধ্যতামূলক অপসারণ (Compulsory removal):** নিম্নোক্ত যে কোনো কারণে একজন পরিচালক বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানি থেকে অপসারিত হতে পারেন [ধারা ১০৮(১)]:
    i. যদি কোনো পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার ষাট (৬০) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ে ব্যর্থ হয়;
    ii. উপযুক্ত আদালত কর্তৃক যদি তাকে মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ বলে সাব্যস্ত করা হয়;
    iii. যদি তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন;

iv. যদি তিনি তার শেয়ারের ওপর তলবকৃত অর্থ পরিশোধের আবেদন জানানোর তারিখ হতে ছয় মাসের মধ্যে তা পরিশোধে ব্যর্থ হন;
v. যদি তিনি সাধারণ সভায় অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপক, আইন উপদেষ্টা, কারিগরি উপদেষ্ট বা ব্যাংকার ব্যতীত অন্য কোনো লাভজনক পদ গ্রহণ করেন;
vi. যদি তিনি বিনা অনুমতিতে পর পর তিনটি সভায় ক্রমাগত তিনমাস ধরে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
vii. যদি তিনি ১০৩ ধারা লংঘন করে কোম্পানির নিকট হতে ঋণ বা গ্যারান্টি গ্রহণ করেন;
viii. যদি তিনি কোম্পানি আইনের ১০৫ ধারা লংঘন করে কোম্পানির সাথে কোনো অবৈধ ক্রয়বিক্রয় কার্য সম্পাদন করেন।

৩. **সরকার কর্তৃক অপসারণ (Removal by the Government):** কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতের সুপারিশক্রমে সরকার কোম্পানির পরিচালককে অপসারণ করতে পারেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তার কার্যাবলি

Managing directors and their functions

ব্যবস্থাপনা পরিচালক একটি কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মুখ্য নির্বাহী। কোম্পানির সাথে চুক্তিবলে কিংবা সদস্যদের সাধারণ সভা বা পরিচালক পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিংবা স্মারকলিপি বা পরিমেল নিয়মাবলিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোম্পানির পরিচালকদের মধ্য থেকে একজনকে কোম্পানির কার্যাবলি নির্বাহ করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনিই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পরিচিত।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১)(ঠ) ধারায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলতে এমন একজন পরিচালককে বোঝায়, যার ওপর কোম্পানির সাথে চুক্তিবলে অথবা সাধারণ সভা বা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে অথবা স্মারকলিপি বা পরিমেল নিয়ামাবলির বিধান অনুযায়ী কোম্পানির ব্যবস্থপনার মূল ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। যে ক্ষমতা তিনি অন্যথা প্রয়োগ করতে পারতেন না এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে আসীন কোনো একক ব্যক্তি তাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।

পরিচালক ছাড়া অন্য কাউকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা যায় না। ফলে দেখা যায় তিনি একদিকে যেমন কোম্পানির একজন পরিচালক অন্যদিকে কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা। তিনি কোম্পানির সার্বক্ষণিক পরিচালক। পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে থেকে তিনি কোম্পানির যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির একজন মুখ্য নির্বাহী। কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে তাকে একদিকে কোম্পানির একজন সাধারণ পরিচালকের কাজ এবং অন্যদিকে পুরো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিম্নে এ কার্যাবলিসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. পরিচালকমণ্ডলীর সহযোগিতায় ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণ করা।
২. গৃহীত নীতিগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানির কাজ কর্ম চলছে কিনা তার প্রতি লক্ষ রাখা।
৪. কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও নির্বাহীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
৫. ব্যবসায়ের কর্মসূচি তৈরি করে তা বিভিন্ন বিভাগে বণ্টন করা।
৬. কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
৭. অফিসারদের নিয়োগ,বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৮. ব্যবসাযের প্রয়োজনে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
৯. কোম্পানির প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা।
১০. পরিচালক পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করা।

১১. পরিচালক পর্ষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১২. পরিচালক পর্ষদের নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্যাবলি পেশ করা।
১৩. কোম্পানির উন্নতির লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ রক্ষা করা।
১৪. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১৫. ব্যবসায় সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৬. সর্বোপরি কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্তে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চিত্র স্বত্ব: বিজি লাইফ ইজি

বিশ্বব্যাপী এপেক্স

মাত্র দুদশক আগে যাত্রা শুরু করে এপেক্স এখন দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর এপেক্সের তৈরি ৪৫ লাখ জোড়া জুতা পৌঁছে যায় ৪০টি দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকি ও জেসি পেনি, জাপানের এবিসি মার্ট এবং জার্মানির ডেইচম্যানসহ বিশ্বের বড় খুচরা বিক্রেতারা এপেক্সের গ্রাহক। একই সঙ্গে দেশীয় বাজারেও প্রতিবছর তিন লাখ জোড়া জুতা প্রস্তুত করে এপেক্স। সাড়ে পাঁচশ খুচরা দোকানের মাধ্যমে এগুলো চলে যায় মানুষের পায়ে। এ কোম্পানির সাফল্যের গান এখন গাওয়া হচ্ছে দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকায়।

গাজীপুরে তাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কর্মীরা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। সেখানকার শ্রমিকদের মাসিক গড় বেতন ৮ হাজার টাকা। এ ছাড়া সকল কর্মী লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। আছে স্বাস্থ্য ও জীবনবিমার সুবিধাও। দুই দশক আগে যাত্রা শুরু করা এপেক্স বর্তমানে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে জুতা প্রস্তুতকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক মনজুর এলাহী। তিনি বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান। মনজুর এলাহী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে বাংলাদেশে আসেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান কোম্পানিতে যোগ দেন। তবে তিনি ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিলেন। সেই তাগিদে ১৯৭৫ সালে তিনি ১২ লাখ টাকা ব্যয় করে ঢাকার হাজারীবাগে একটি কোম্পানি ক্রয় করেন। নাম দেন 'এপেক্স ট্যানারি'। সেখান থেকেই তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান।

সূত্র: ক্যানভাস

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি পরিচালনা করেন মূলত পরিচালকরা। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তাদের প্রত্যেককে পরিচালক এবং সম্মিলিতভাবে পরিচালকমণ্ডলী বলা হয়। কোম্পানি সংগঠনের পরিচালকদের কার্যাবলি কোম্পানি আইনের পরিমেল নিয়মাবলি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রম পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হচ্ছে কিনা পরিচালকমণ্ডলী তা দেখাশুনা করেন। কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন। পরিচালকদের ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণত পরিমেল নিয়মাবলিতে বিশেষ ধারার উল্লেখ থাকে। পরিমেল নিয়মাবলিতে পরিচালকদের ক্ষমতার যে সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থেকেই পরিচালকগণকে কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু যদি তারা এ সীমার বাইরে কোনো কাজে জড়িত হয়ে পড়েন তবে প্রত্যেক পরিচালককে ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে দায়বদ্ধ হতে হয়। পরিচালকদের ১/৩ ভাগ প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য।

পাঠ ৬.৮ কোম্পানির সভা ও বিলোপসাধন
Company Meetings and Dissolution

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কোম্পানি সভা কী বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি সভা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন বলতে কী বোঝায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোম্পানির বিলোপসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানির ব্যবসায় অব্যাহত থাকাকালে নিয়মিতভাবে কিছু সভা আহবান করতে হয়। কিছু সভা আছে শুধু পরিচালকমণ্ডলীর, কিছু সভা শেয়ারহোল্ডারদের, কিছু সভা কোম্পানির পাওনাদারদের। এসব সভার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য এবং কোম্পানির বিলোপসাধন সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত এ পাঠটি আমরা অধ্যায়ন করবো।

কোম্পানি সভা
Company Meeting

কোনো আইনানুগ কার্য সম্পাদনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাদের সম্মিলনকে সাধারণ অর্থে সভা বলা হয়। কোনো কোম্পানির সদস্য বা পরিচালক বা ঋণদাতাগণ কোম্পানি আইনের বিধান বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোম্পানির কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যে সভায় মিলিত হন সে সভাকে কোম্পানি সভা বলা হয়। কোম্পানি সভা বিভিন্ন কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন:

i. আইনের বিধান প্রতিপালনের জন্য;
ii. কোনো বিশেষ বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য;
iii. কোম্পানি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যাদি বিনিময় করার জন্য;
iv. কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লিখিত কোনো বিষয় বা রীতি অনুসরণের জন্য।

কোম্পানি সভা সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিচে আলোচিত হলো:

- **জে. সি. ডেনিয়ার** (J. C. Denyer) এর ভাষ্যমতে, "সংশ্লিষ্ট সকলের (শেয়ারহোল্ডার/ পরিচালক/পাওনাদার) যৌথ স্বার্থ রক্ষাকল্পে আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভাকে কোম্পানি সভা বলে।" [Company meeting means an organized assembly of persons (shareholders/directors/creditors) according to law fir transaction of business of company interest][৫]
- **আউয়াল খান ও সহযোগীদের** মতে, "কোম্পানি আইন অনুযায়ী এবং প্রচলিত প্রথানুসারে কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত সদস্যদের/পরিচালকদের /পাওনাদারদের সভাকেই কোম্পানি সভা বলে।"

সুতরাং কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালকমণ্ডলী কিংবা ঋণদাতাগণ পারস্পরিক তথ্য ও মতামত বিনিময়ের নিমিত্তে সমবেত হলে বা সভায় মিলিত হলে তাকে কোম্পানি সভা বলে।

[৫] J. C. Denyer (2013). *Office management*, Kindle edition, p. 203

কোম্পানি সভার প্রকারভেদ

Kinds of company meeting

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী, শেয়ারহোল্ডার এবং ঋণদাতাগণ কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। একটি কোম্পানি সংগঠনে সাধারণত নিম্নে আলোচিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে:

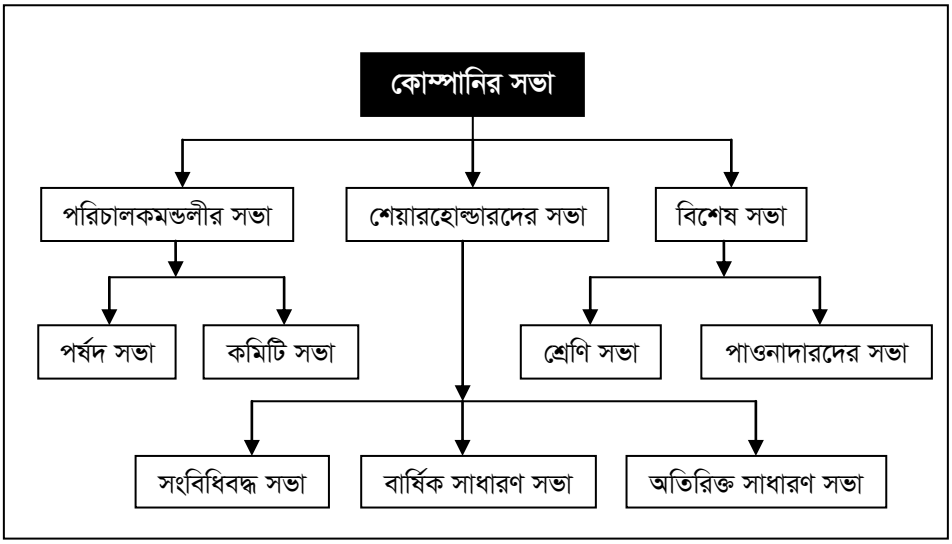

চিত্র ৬.৪: কোম্পানি সভার প্রকারভেদ

- **পরিচালকমণ্ডলীর সভা (Meeting of the board of directors):** কোম্পানি আইন ও সংঘবিধি বা পরিমেল-নিয়মাবলির নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সভাকে পরিচালকমণ্ডলীর সভা বলে। পরিচালকমণ্ডলীর সভাকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

  ক. পর্ষদ সভা (Board meeting): কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ তাদের ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যে সভায় মিলিত হন তাকে পর্ষদ সভা নামে অভিহিত করা হয়।

  খ. কমিটি সভা (Committee meeting): কোম্পানির কোন বিশেষ বিষয় বা কাজ তদারক করার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর কতিপয় সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্যগণ যে অধিবেশনে মিলিত হন তা কমিটি সভা নামে পরিচিত।

- **শেয়ারহোল্ডারদের সভা (Shareholders meeting):** কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ার মালিকগণ যে সভায় একত্রিত হন তাকে শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ার মালিকদের সভা বলে। শেযারহোল্ডারদের সভা আবার তিন প্রকার, যথা:

  ক. বিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting): কোম্পানি গঠনের পর এর শেয়ারহোল্ডারগণ সর্বপ্রথম যে সাধারণ সভায় মিলিত হয় তাকে বিধিবদ্ধ সভা বলে।

  খ. বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual general meeting): প্রতিটি আর্থিক বছর শেষে কোম্পানির সাধারণ সদস্যগণ যে সভায় মিলিত হন তাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলে। প্রতিবছর অন্তত একবার এ সভা আহ্বান করতে হয়।

  গ. অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extra ordinary general meeting): যেকোনো সময় কোনো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাই অতিরিক্ত সাধারণ সভা।

- **বিশেষ সভা (Special meeting):** ওপরে আলোচিত সভাসমূহ ছাড়া কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরও কতিপয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যথা-

  ক. শ্রেণি সভা (Class meeting): কোম্পানিতে বিভিন্ন শ্রেণির শেয়ার থাকে; যেমন-সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার ইত্যাদি। এক এক শ্রেণির শেয়ারের নামানুসারে শেয়ার মালিকদের নামকরণ করা হয়। কাজেই কোনো বিশেষ শ্রেণির শেয়ার মালিকদের স্বার্থে যে সভা আহবান করা হয় তাকে শ্রেণি সভা বলা হয়।

  খ. পাওনাদারদের সভা (Creditors meeting): কোম্পানির ঋণদাতা বা পাওনাদারদের (উত্তমর্ণ) বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাকে পাওনাদারদের সভা বা ঋণদাতাদের সভা বলা হয়।

কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন

Dissolution/Winding up of the company

কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশেষ। তাই স্বাভাবিক ব্যক্তির ন্যায় কোম্পানির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে পারে না। কৃত্রিম ব্যক্তি বিধায় কোম্পানির অবলুপ্তির জন্য কতিপয় নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোম্পানির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানির সমাপ্তি ঘটাতে হয় তাকে কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন বলে। অর্থাৎ কোম্পানির বিলোপসাধন হলো একটি আইনানুগ প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোম্পানি আইনগত সত্তার অবসায়ন ঘটানো হয় এবং ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলা হয়।

কোম্পানির অবসায়ন সম্পর্কে **অধ্যাপক গাওয়ার** বলেন, "কোম্পানির অবসায়ন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা এর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় এবং পাওনাদার ও সদস্যদের কল্যাণে এর পরিসম্পদ ব্যবহার করা হয়"।

কোম্পানি আইনের দ্বারা সৃষ্ট। তাই যখন এর আইনগত অস্তিত্বের অবসায়ন ঘটিয়ে ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন তা অবসায়ন নামে পরিচিত হয়। স্বাভাবিক ব্যক্তির যেমন মৃত্যু ঘটে তেমনি অবসায়নের ফলে কৃত্রিম ব্যক্তি কোম্পানিরও মৃত্যু ঘটে। কোম্পানির অবসায়নের জন্য একজন প্রশাসক বা অবসায়ক নিয়োগ করা হয়। অবসায়ক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন, এর সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনাদারদের দেনা শোধ করেন এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেন।

কোম্পানির বিলোপসাধন পদ্ধতি

Methods of dissolution of a company

কোম্পানি হচ্ছে একটি আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা, এর বিলোপসাধনেও তাই আইনগত বিধিবিধান পালন করতে হয়। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে ২৩৪ ধারায় কোম্পানির বিলোপসাধনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আইনের এ বিধানগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

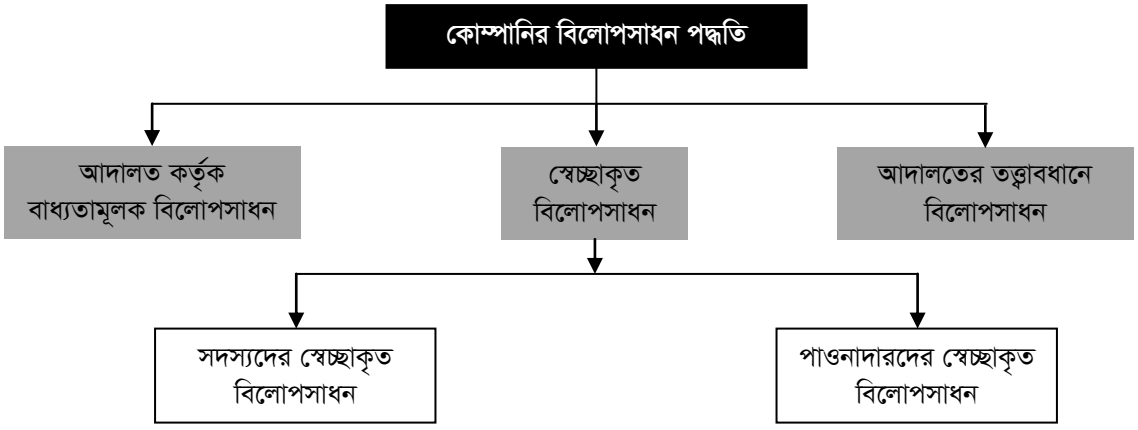

চিত্র ৬.৫: কোম্পানির বিলোপসাধন পদ্ধতি

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে বর্ণিত নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে কোম্পানিরর বিলোপসাধন করা যেতে পারে:

১. **আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন (Compulsory dissolution by the court):** কোম্পানি আইনের ২৪১ ধারার বিধান অনুসারে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কোম্পানির বিলোপসাধন হলে তাকে বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন বলে। যে সব অবস্থার প্রেক্ষিতে আদালতের অধীনে কোম্পানির বাধ্যতামুলক অবসায়ন হয় তা নিম্নে বর্ণিত হলো:

i. আদালত কর্তৃক কোম্পানির বিলোপসাধন করা হোক এ মর্মে যদি কোম্পানি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে আদালত কোম্পানির বিলোপসাধনের নির্দেশ দিতে পারে;
ii. নিবন্ধকের নিকট বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে না পারলে কোম্পানির বিলোপসাধন করা যেতে পারে;
iii. যদি কোম্পানি নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ব্যবসায় শুরু না করে অথবা পুরো এক বছরের জন্য ব্যবসায় বন্ধ রাখে;
iv. প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ২ এর নিচে এবং পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে ৭ এর নিচে নামলে;
v. যদি কোম্পানি দেনা পরিশোধে অক্ষম হয়;
vi. যদি আদালত অন্য কোনো বিশেষ কারণে ব্যবসায়ের বিলোপসাধনকে আইনসম্মত মনে করে।

২. **কোম্পানির স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন (Voluntary dissolution of company):** আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোম্পানির সদস্যবৃন্দ বা পাওনাদারগণ কোম্পানির বিলোপসাধন করলে তাকে স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন বলে। কোম্পানি আইন অনুসারে স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন দুই প্রকার:

ক. **সদস্যদের স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন:** সদস্যদের স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন তখনই সম্ভব যখন কোম্পানি আর্থিক দিক থেকে সংগতিসম্পন্ন হয় এবং নিজের দেনা পরিশোধে সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে। কোম্পানি আইনের ২৮৬ ধারায় সদস্যদের স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধনের বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

i. কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে কোম্পানির বিলোপসাধন করা হবে- এ মর্মে পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লেখ থাকবে এবং উক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে;
ii. কোম্পানির স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন ঘটানোর জন্য যদি কোম্পানি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;
iii. কোম্পানি যদি খুব বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে;

খ. **পাওনাদারদের স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন:** কোম্পানির আর্থিক সংগতি ঘোষণা ছাড়াই কোম্পানির স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা পাওনাদারদের স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন নামে পরিচিত। দেউলিয়া কোম্পানি কর্তৃক এ ধরনের বিলোপসাধনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এরূপ বিলোপসাধন সংক্রান্ত কার্যকলাপে পাওনাদারদের আধিপত্য থাকে। কোম্পানির দায়-দেনার কারণে কোম্পানি অসাধারণ প্রস্তাবের দ্বারা এ ধরনের বিলোপসাধন ঘটায়।

৩. **আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন (Dissolution under supervision of the court):** ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৩১৬ ধারা মতে, স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধনের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যে কোনো সময় আদালত এ মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে, আদালতের মাধ্যমে কোম্পানির বিলোপসাধনের কার্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত তত্ত্বাবধানের কাজ করার নির্দেশ দিতে পারেন:

ক. কোম্পানির অবসায়ক সম্পত্তি সংগ্রহে পক্ষপাতিত্ব বা অবহেলা করলে;
খ. বিলোপসাধনের নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন না করলে;
গ. প্রতারণার মাধ্যমে বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে;
ঘ. অন্য যে কোনো কারণে আদালত যদি বিলোপসাধনের দায়িত্ব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে।

আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নের নির্দেশদানের পর আদালত এক বা একাধিক অবসায়ক নিয়োগ দিতে পারেন। তারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নে নিযুক্ত অবসায়কের ন্যায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

কোনো আইনানুগ কার্য সম্পাদনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাদের সম্মিলনকে সাধারণ অর্থে সভা বলা হয়। কোনো কোম্পানির সদস্য বা পরিচালক বা ঋণদাতাগণ কোম্পানি আইনের বিধান বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোম্পানির কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যে সভায় মিলিত হন সে সভাকে কোম্পানি সভা বলা হয়। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী, শেয়ারহোল্ডার এবং ঋণদাতাগণ কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশেষ। তাই স্বাভাবিক ব্যক্তির ন্যায় কোম্পানির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে পারে না। কৃত্রিম ব্যক্তি বিধায় কোম্পানির অবলুপ্তির জন্য কতিপয় নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোম্পানির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানির সমাপ্তি ঘটাতে হয় তাকে কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন বলে। কোম্পানি হচ্ছে একটি আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা, এর বিলোপসাধনেও তাই আইনগত বিধিবিধান পালন করতে হয়। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে ২৩৪ ধারায় কোম্পানির বিলোপসাধনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. কোম্পানি সংগঠন কাকে বলে? কোম্পানি সংগঠনের আইনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২. যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৩. কোম্পানি সংগঠনের সংজ্ঞা দিন। এর গুরুত্ব বর্ননা করুন।
৪. কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৫. কোম্পানির কৃত্রিম সত্তা কী? কোম্পানি একজন ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে কীভাবে? বিশদভাবে আলোচনা করুন।
৬. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন।
৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে? এর সুবিধাবলি উল্লেখ করুন।
৮. প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৯. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে? এর সুবিধাবলি উল্লেখ করুন।
১০. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে কীভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা যায়? আলোচনা করুন।
১১. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী কী বিশেষ সুবিধা ভোগ করে?
১২. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অসুবিধাগুলো কী কী?
১৩. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অসুবিধা আলোচনা করুন।
১৪. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন।
১৫. সরকারের অনুমতি ব্যতিত কোম্পানির পরিচালকদের স্থান দিতে হলে কোন ধরনের কোম্পানির জন্য তা সম্ভব হবে?
১৬. বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে হয় কোন জাতীয় কোম্পানির ক্ষেত্রে?
১৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে কি? ঋণপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৮. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কীভাবে গঠন করা যায়?
১৯. কোম্পানির প্রবর্তক কে? প্রবর্তকের শ্রেনিবিভাগ আলোচনা করুন।
২০. স্মারকলিপি কী? পরিমেল নিয়মাবলির সাথে এর পার্থক্য বর্ণনা করুন।
২১. কোম্পানির সংঘস্মারক কী? এর ধারাগুলো এবং বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
২২. কোম্পানির স্মারকলিপি কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?
২৩. বিবরণপত্র কাকে বলে? এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।